প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

প্রেসলিঙ্ক কলিকাতা

শ্রীঅমিতকুমার দাস কর্তৃক দাস প্রিন্টার্স, ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
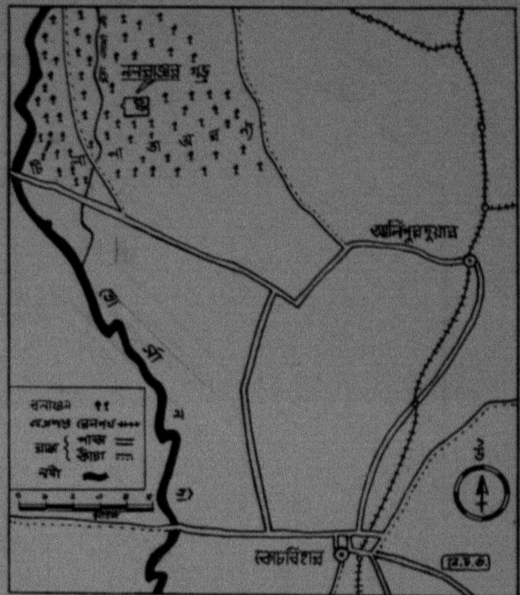
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

১

২

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত চিলাপাতা অরণ্যে প্রসারিত

নলরাজার গড়

সমীক্ষার দ্বারা গঠিত ভিত্তিচিত্র

উ

অরণ্য ছায়ার দুর্গে
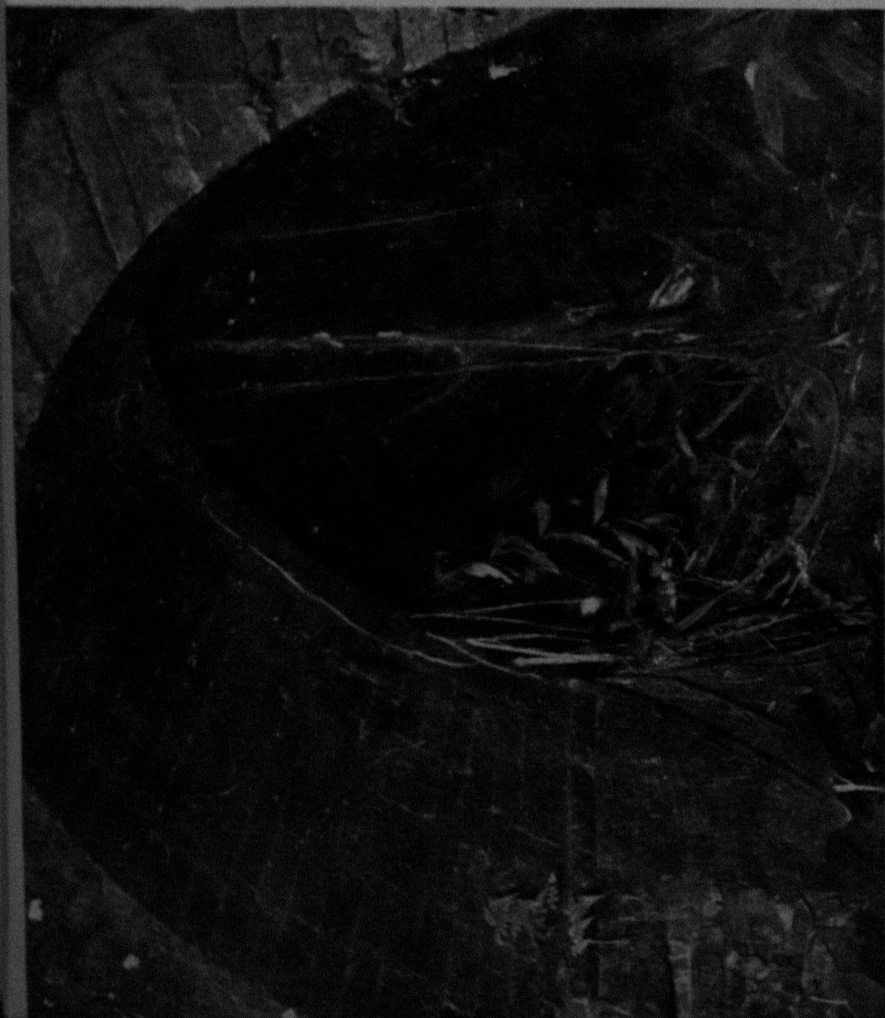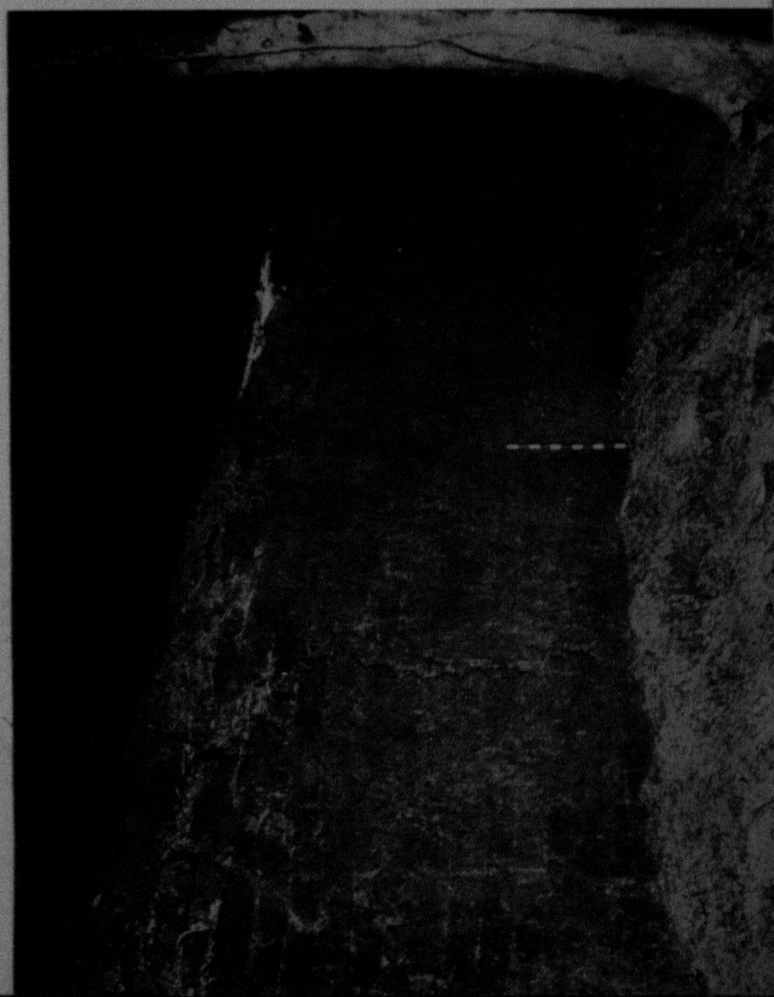
শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী, মন্ত্রী
পূর্ত বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ

গাঙ্গেয় সমতলের উত্তরে প্রসারিত দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় এক মহান শৈল-প্রাকারের মতই চিরকাল আড়াল করে রেখেছে মধ্য-এশিয়ার উচ্চভূমিকে। আজকের মত অতীতেও এই পর্বতমালার শৃঙ্গ ও উপত্যকাগুলি সাক্ষ্য দেয় নানা শতাব্দীর অভিযাত্রী, সার্থবাহ, জাতি-গোষ্ঠীর কীর্ত্তি ও অভীপ্সার। এই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিঘোষিত হয়েছে মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। এইভাবেই উত্তর-বাঙলায় জলপাইগুড়ি জেলায় প্রসারিত চিলাপাতা অরণ্যে অবস্থিত নলরাজার গড়ের সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ যেন বিবৃত করে গুপ্তযুগের সামরিক স্থাপত্যের একখণ্ড ইতিহাস এবং সেই পর্বের এক যুযুধান সেনা-শিবিরের অপরিমেয় রহস্য। চিলাপাতা বনভূমিতে ১৯৬৭ সালে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এক অভিযান ও সমীক্ষার ফলে যে সব অমূল্য তথ্যাদি সংগৃহীত হ'য়েছে তা' প্রাচ্য ভারতীয় পুরাতত্ত্বের এক নূতন দিগন্তকে নির্দেশ করে, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে। "অরণ্যচ্ছায়ার দুর্গে" শীর্ষক গ্রন্থটি এই অভিযানেরই বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক গবেষণার দ্বারা সমৃদ্ধ।

সুবোধ ব্যানার্জী
১২/৩/৬৯
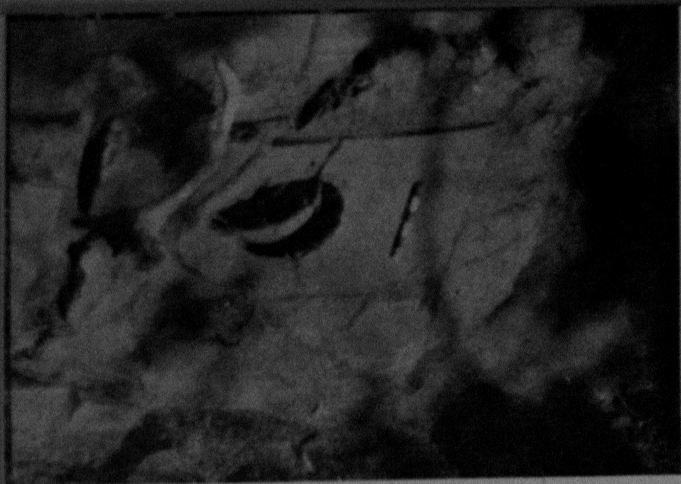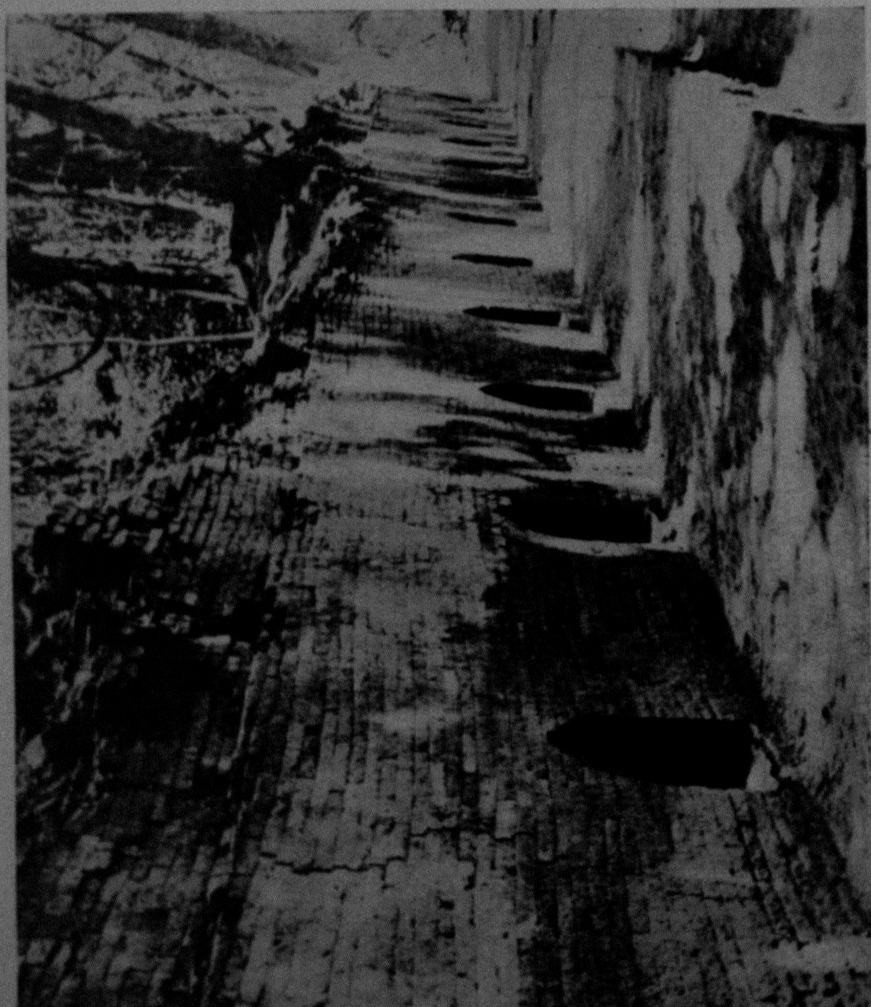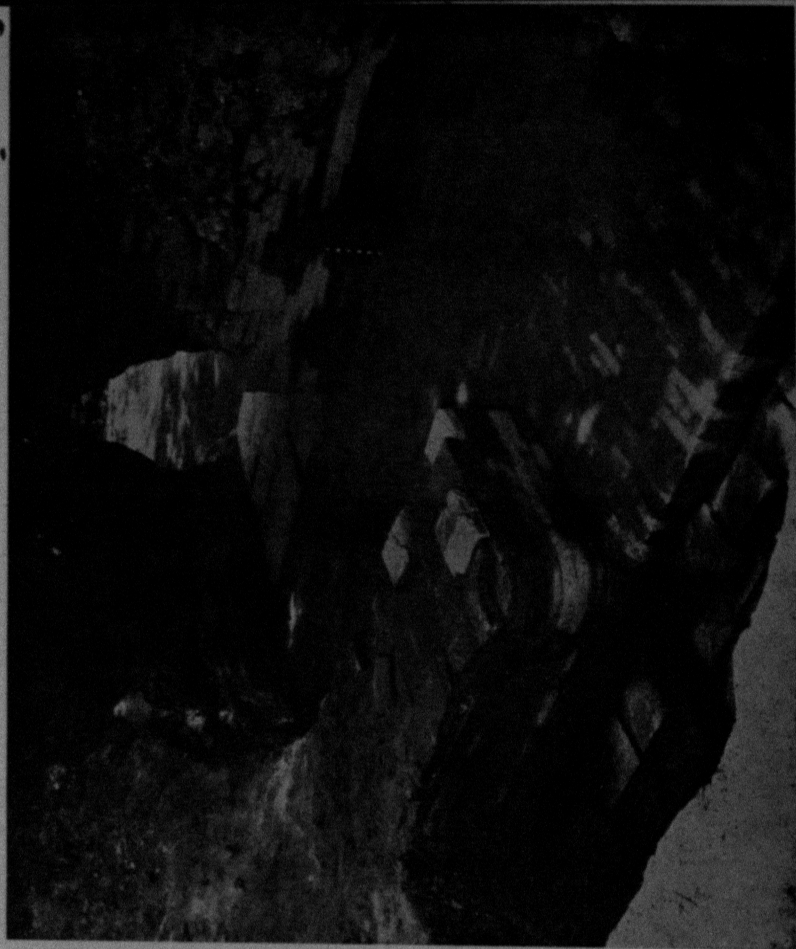
বিষয় সূচী

১৩

১৪
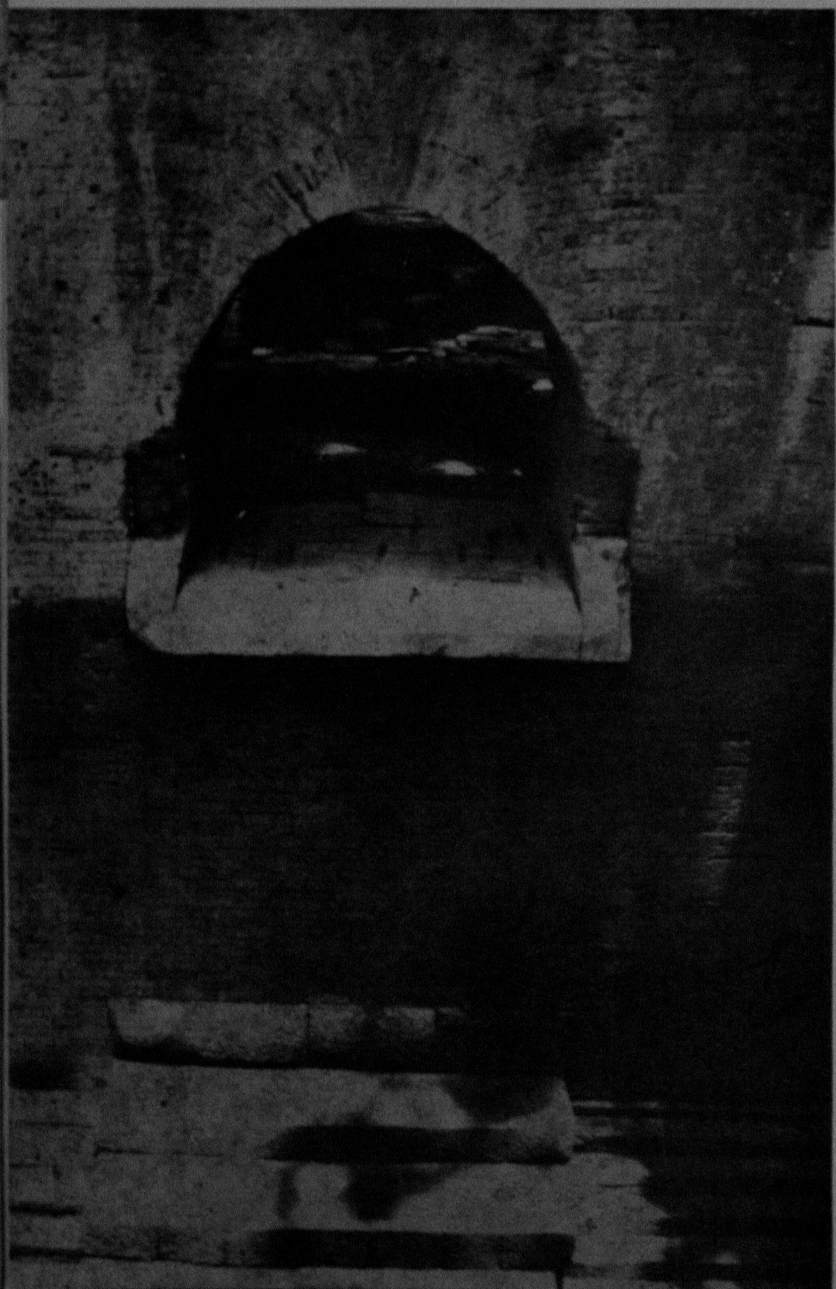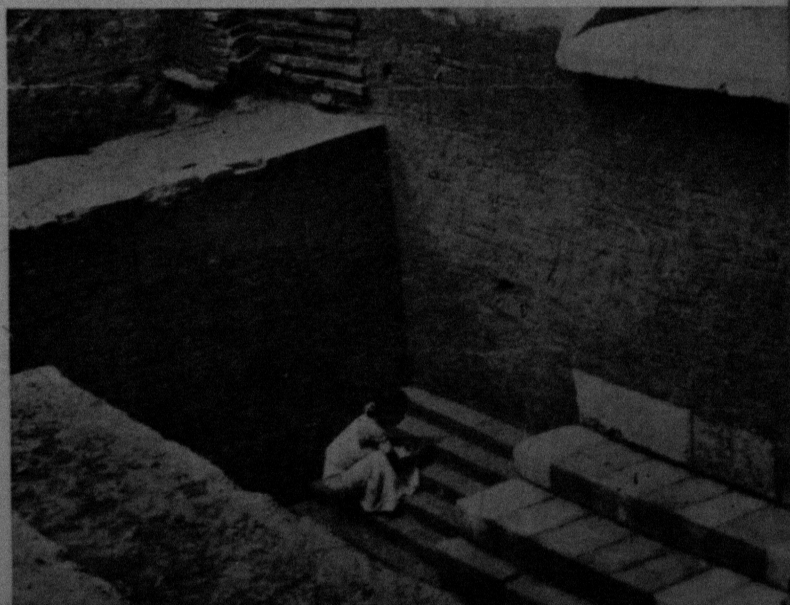
ভূমিকা

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আজ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, যে, বাঙলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত রচনা করেছে তার বর্ণাঢ্য দিগন্ত। বহু শতাব্দীব্যাপী প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ক্রমঃবিবর্তিত অথবা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত সভ্যতার ইতিহাস যেন আজ বিভিন্ন পুরাকীর্তি ও সংশ্লিষ্ট কিম্বদন্তীসমূহের চিরন্তন সংলাপে মুখর। এই দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিসর্গ-দৃশ্যের অন্তরালে প্রকৃতই রচিত হ'য়েছে পুরাতন শতাব্দীসমূহের এমন সব রহস্য ও মোহ যা আজ স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও অভীপ্সার প্রেরণা-স্বরূপ। পশ্চিম বাঙলার দিগন্তপ্রসারী সমতল, নিবিড় অথবা ম্রিয়মাণ অরণ্য, অনুচ্চ শৈলাঞ্চল এবং দুর্গম উদীচ্য-প্রান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস যে এখনও অনেকাংশে অনাবিষ্কৃত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সব অঞ্চলের প্রাচীন পরিবেশে বিরাজিত বিস্মৃত পুরাকীর্তি কিংবা ধ্বংসাবশেষগুলি এবং ভূস্তরে নিহিত বিভিন্ন অধিবসতিসমূহের পরম্পরাগত স্তর-বিন্যাস অথবা বিচ্ছিন্ন সংস্তর প্রায়ই সাক্ষ্য দেয় সাংস্কৃতিক অভিলাষ, সমষ্টি-চেতনা কিম্বা আদর্শ-ভিত্তিক ভাবনা-বৈচিত্র্যের যা'র সঙ্গে কখনও বা সংশ্লিষ্ট তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা ও মর্য্যাদাবোধ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, যে, ভারতের প্রাক্-ইসলামীয় স্থাপত্যসমূহের ব্যাপকতর শ্রেণীকরণ ও তার পশ্চাতে নিহিত বাস্তব প্রেরণার মূল্যায়ন অনিবার্য্যভাবে অপেক্ষমান ভবিষ্যতের অগ্রসারী অনুসন্ধান ও গবেষণার উত্তরণ-পথের আকাঙ্ক্ষিত দূরত্বে ও অনির্দিষ্ট সীমায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, এদেশের প্রাচীন (প্রাক্-ইসলামীয়) দুর্গসমূহ, প্রতিরক্ষা-স্থাপত্য, রাজপথ, সেতু, নিবাস-গৃহ, পোতাশ্রয়, শস্যভাণ্ডার ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন। এই সব বিষয়ে ইতিমধ্যেই যে সব আবিষ্ক্রিয়া সংঘটিত হ'য়েছে তার দ্বারা স্বভাবতঃই প্রমাণিত হবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় জীবনের এক আপাত-অবগুণ্ঠিত বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্যময় ঋজুতা। পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ রাজ্যের বিভিন্ন নদ্য-তট, শৈল-উপত্যকা ও অরণ্যাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি প্রসঙ্গে এই ধরণের অনুসন্ধান, অভিযান ও গবেষণার প্রয়োজন অবশ্য-স্বীকার্য্য। এই বৈজ্ঞানিক কর্মোদ্যোগ ও অন্তরঙ্গ অনুধাবনতার দ্বারাই সম্ভব বিস্মৃত ইতিহাসের যথাযোগ্য প্রস্তুনা, মূল্যায়ন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ইতিপূর্বে অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন স্থানে নানা
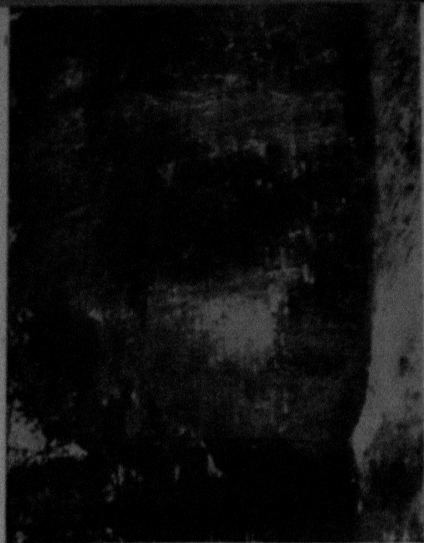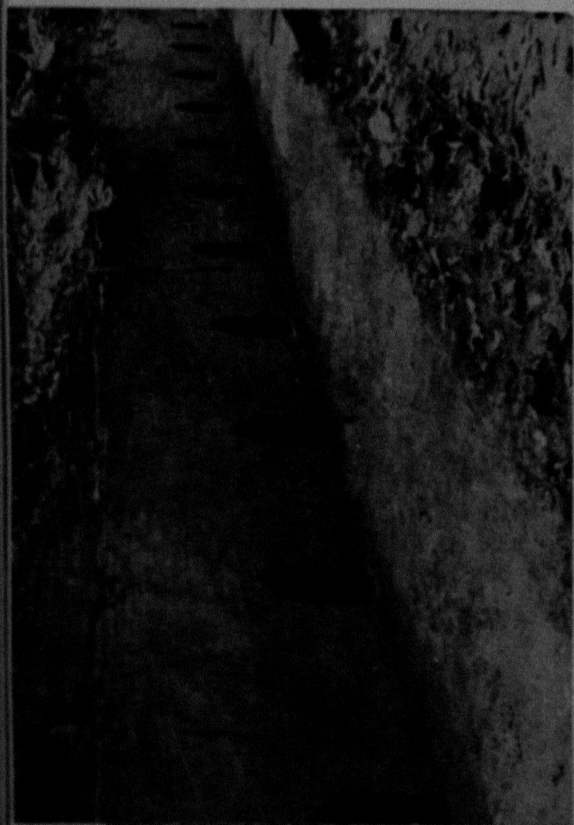
উল্লেখনীয় প্রত্ন-কীর্তি আবিষ্কৃত হ'লেও এমন কোন বিপুল ধ্বংসাবশেষ আলোচিত হয়নি যেখানে প্রতিভাত হবে প্রাক্-পাল অথবা গুপ্ত-পালযুগের একনিষ্ঠ প্রত্যন্ত-নীতি তথা প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি। উত্তর বাঙলার দুয়ার ও তার সন্নিহিত নিবিড় অরণ্য যেখানে ভুটান শৈলমালা পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে আজ আবিষ্কৃত হ'য়েছে ইট নির্মিত এমন এক সুবিশাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ যা'র অসাধারণত্ব বিস্ময়কর ও রহস্যময়। চিলাপাতা বনভূমিতে অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গের সুদৃঢ় প্রাকার-গুলির নির্মাণ-কৌশলে প্রতিভাত হয় এমন এক মর্য্যাদাময় পরিকল্পনা যা'র প্রেরণার উৎস হয়ত বা কোন বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা-নীতি ও নির্ভীক অগ্নসজ্জা। প্রকৃতপক্ষে, হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরসমূহ ও এই পর্বতমালার অরণ্যাবৃত উপত্যকাশ্রেণীর অদূরে নির্মিত এই রহস্যময় হর্ম্যটির উপস্থিতি যেন স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের সীমান্ত নীতিকে যা'র সঙ্গে বিজড়িত দূর-প্রদেশে প্রেরিত শান্ত্রীদের শৌর্য্য ও বিশ্বস্ততা-চিহ্নিত বিভিন্ন পর্ব তথা যুগ সন্ধিক্ষণ। স্থানীয় কিংবদন্তীতে কীর্তিত এই দুর্গই নলরাজার গড় যা'র জীর্ণ প্রাকারগুলি ঘনীভূত করেছে এখানে প্রসারিত অরণ্য ছায়ার পুরাতন রহস্যকে। হিমালয়ের নিভৃত অঙ্গনে ঘন পত্রাবৃত ও দীর্ঘদেহা তরুরাজির অন্তরালে বিরাজিত এই দুর্গের উচ্চ প্রাচীর, প্রবেশ-পথ, খিলান, বুরুজ, চুল্লির ন্যায় গঠিত সনল কুলুঙ্গি, অভ্যন্তর ও বহিঃসীমায় সৃষ্ট পরিখা, সুরক্ষিত দ্বার-কক্ষ, প্লাবন-বারি নিকাষণের নিমিত্ত বাঁধানো পয়ঃপ্রণালী, অন্তঃপ্রাকার ও বহিঃপ্রাকারের সংগঠন ও পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক মননশীলতা ও সামঞ্জস্যবোধ এবং পার্শ্বভূমিতে একদা কারুমণ্ডিত পাষাণখণ্ডে নির্মিত মন্দির-শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় ইতিহাসের এক তাৎপর্য্যময় পটভূমিকার যা'র সঙ্গে হয়ত বা বিজড়িত যুযুধান সেনানীদের আক্রমণ, প্রতিরোধ ও বিস্তৃত সংঘর্ষ। গুপ্ত ও পালযুগের লক্ষণাক্রান্ত নলরাজার গড় ও তার নিকটস্থ উপদুর্গ স্মরণ করিয়ে দেবে গুপ্ত-বংশীয় প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও তাঁদের পরবর্ত্তী সম্রাটদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও সীমান্ত নীতি এবং পালযুগের সামরিক অগ্রগতিকে। এছাড়া, পরবর্তীযুগে বর্তমান বঙ্গ-ভুটান সীমান্ত তথা উত্তর-বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা ছিল অব্যাহত যা'র বিচ্ছিন্ন অথচ কতকটা পরম্পরাগত উল্লেখের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তবকাত্-ই-নাসিরী, মার্কো-পোলোর বৃত্তান্ত, কোচবিহার ও কামরূপের ইতিহাস এবং রালফ্ ফিচ্ ও ক্যাপ্টেন বোয়লো পেম্বারটনের রচনায় ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর তথ্যাদিতে। এই ইতিবৃত্তের তাৎপর্যময় আখ্যানগুলি পাঠে
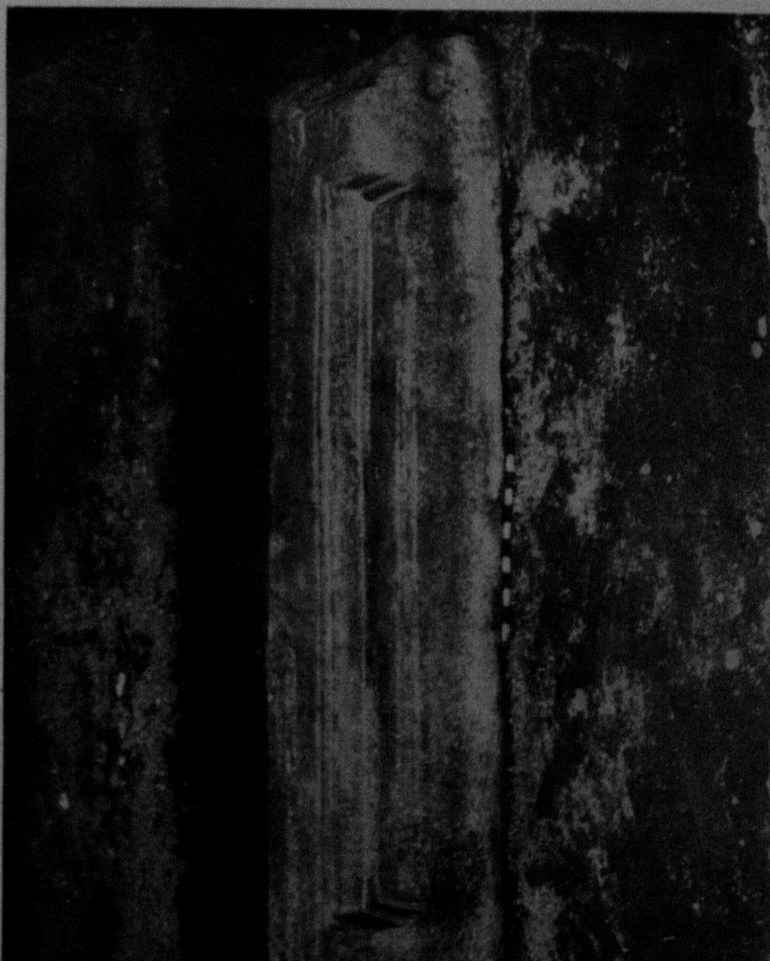
অনুমান করা যায় বাঙলার উত্তর-সীমান্তের এমন এক অসাধারণ পটভূমিকার বৈচিত্র্য যা'র রহস্যাবৃত দূরবর্তী আভাস পাওয়া যায় কালিম্পং উপত্যকায় আবিষ্কৃত বহু সংখ্যক নবাশ্মর কুঠার ও অপরাপর হাতিয়ারসমূহের বৈশিষ্ট্যে এবং বহির্দেশীয় আকৃতিতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত ক্রমান্বয় অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত এই সব নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন কয়েকটি সছিদ্র কুঠার ও অন্যান্য শ্রেণীর হাতিয়ার বিদ্যমান যেগুলি বিস্ময়করভাবে তুলনীয় চীনদেশে প্রবাহিত ইয়াংত্-সি-কিয়াং এবং হয়াং-হো নদীদ্বয়ের অববাহিকায় আবিষ্কৃত একই ধরণের নির্দিষ্ট রূপাশ্রয়ী (standardised) বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সঙ্গে। প্রকৃত-পক্ষে, দার্জিলিং হিমালয় এবং তার নিম্নে প্রসারিত অরণ্য, নদ্য-তট এবং বিচ্ছিন্ন সমতলের ইতিহাস স্মরণাতীতকাল থেকেই বিজড়িত মধ্য-এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মালভূমি তথা তুষারমণ্ডিত তিব্বত ও তার সন্নিহিত ভূখণ্ডের সঙ্গে। যুগ-পরম্পরার এই প্রবহমান স্রোতধারা ও সংশ্লিষ্ট সংযোগের খণ্ড দৃষ্টান্ত হয়ত বা পাল যুগে বাংলা ও তিব্বতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিশেষতঃ 'মুঙ্গের অনুশাসনে' সম্রাট দেবপাল কর্তৃক "কম্বোজ" দেশ আক্রমণের উল্লেখ, মার্কো পোলোর বৃত্তান্তে বর্ণিত মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী কুব্লাই খানের অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে "মিয়েন" ও "বাঙ্গালা"র এক অজ্ঞাত অধিপতির সম্মুখে সংগ্রামের কাহিনী, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কোচ সম্রাট বিশ্বসিংহ কর্তৃক ভূটান আক্রমণ ও পরবর্তী সংঘর্ষসমূহ এবং পরিশেষে ইংরাজগণ কর্তৃক উত্তর-বঙ্গের পথে ভূটান অভিযানের ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য্য। এখানে উল্লেখনীয় যে, ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় উদীচ্য বাঙলার ইতিহাসে মূল হিমালয় এবং সংশ্লিষ্ট শৈলমালার প্রভাব ও সান্নিধ্য স্বভাবতঃই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের ফলশ্রুতির প্রকৃত মূল্যায়ন ব্যাপকতর গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। এই বৃহত্তর ও অপরাপর সম্ভাব্য পটভূমিকায় যেমন বিচার্য্য চিলাপাতা অরণ্যের গুরুত্ব, অপর-দিকে তেমন নলরাজার গড়ের অবস্থান ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেবে কৌটিল্য ও শুক্রাচার্য্য বর্ণিত বনদুর্গের কল্পনা ও নির্মাণরীতিকে। চিলাপাতা বনভূমি ('রেঞ্জ') র অন্তর্গত মেন্দাবাড়ী অরণ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত নলরাজার গড় অবশ্যই বনদুর্গের প্রতিরূপ কারণ এখানকার মহীরূহগুলি সাক্ষ্য দেয় এক সুপ্রাচীন পরিবেশের। ভৌগোলিক বিচারেও দুয়ারের অরণ্য ভূস্তর ও আবহাওয়ার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও আদিম। স্থানবিশেষে পরিষ্কৃত হ'লেও এই

২২

২৪

২৫
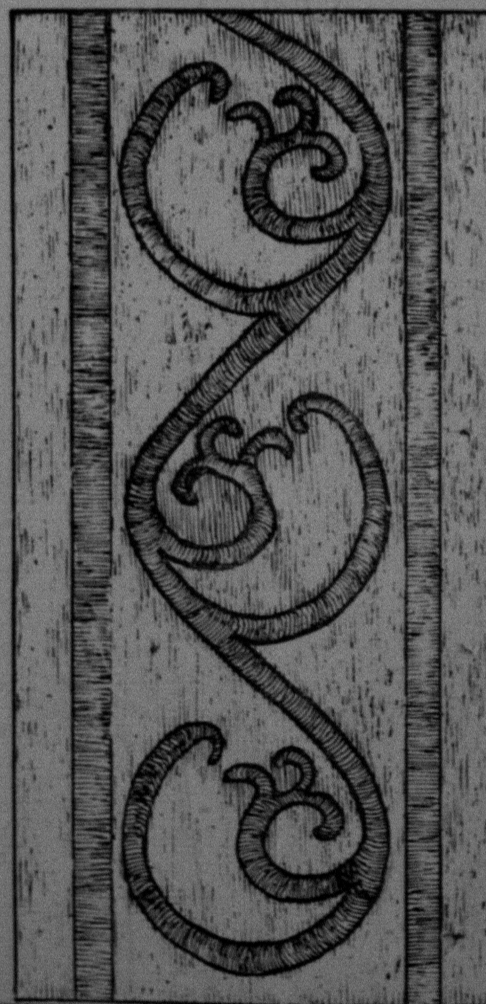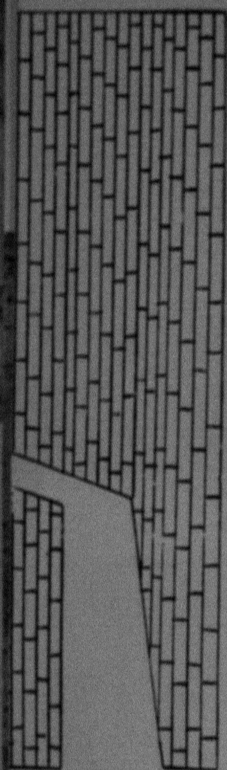
অরণ্যের ছায়াচ্ছন্ন নিবিড়তা বহু ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত। কখনও বা এই বনভূমির প্রান্তভাগ কিম্বা প্রায়ান্ধকার ছায়াতল স্থানীয় কিংবদন্তীর সঙ্গে বিজড়িত হ'য়ে রচনা করেছে রহস্যের উর্ণনাভ। এই ভাবেই যেন চিলাপাতা অরণ্যের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে বিজড়িত হ'য়ে আছে অতীতকাহিনী-খ্যাত নলরাজার নাম। রাজ্যহারা নল ও দময়ন্তী কর্তৃক গহন বনাঞ্চলে প্রবেশ ও বিপন্ন হবার করুণ আখ্যানটির উপযুক্ত পটভূমিকা যেন রচিত হ'য়েছে এখানকার অগম্য পরিবেশে যেখানে রূপকথার মায়াপুরীর মত প্রসারিত আছে নলরাজার গড়।

পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা প্রমাণিত হ'য়েছে, যে, নলরাজার গড়ের শ্রেষ্ঠ নির্মাণকাল গুপ্তযুগে এবং এই প্রতিরক্ষা-অঞ্চলে জনসমাবেশ ছিল পরবর্তী শতাব্দীসমূহে পালসম্রাটদের শাসনকালে ও হয়ত মধ্যযুগে। দুর্গের অবস্থান ও আয়তন যেমন একদিকে কোন রাজশক্তির প্রত্যন্ত-নীতি ও অসাধারণ ক্ষমতাজ্ঞাপক অপরদিকে তেমন প্রতিরক্ষার পরিকল্পনায় ও অভ্যন্তর-প্রদেশে একদা জলপূর্ণ পরিখা অথবা খাল সৃষ্টিতে চীনদেশের সুরক্ষিত প্রাচীন রাজধানী চাঙ-আনএর নির্মাণ-রীতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখনীয় যে, সুই' ও 'টাং' রাজবংশদ্বয় শাসিত চাঙ-আনেও একদা প্রসারিত হ'য়েছিল ভারতের বৌদ্ধ-শিল্প। দুর্গদ্বয়ের পারস্পরিক সাদৃশ্যের গভীরতা যদিও অস্পষ্ট তবুও হয়তো তা' স্মরণ করিয়ে দিতে পারে গুপ্তসম্রাটদের সীমান্ত-নীতিকে এবং ক্রমান্বয় সামরিক সংঘর্ষের ফলে আহরিত অভিজ্ঞতা। অন্ততঃ বৈরীদের পরাভূত করবার জন্ত তাদেরই কৌশল আয়ত্ত করবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। চাঙ-আনএর পরিকল্পনা অবশ্যই আরও প্রাচীনতর রীতির পরিচয় বহন করে। নলরাজার গড়ের প্রতিরক্ষা-কল্পনার আলোচনা-প্রসঙ্গে কামরূপের উপজাতীয় ইতিহাস ও সেখানকার রাজশক্তির প্রভাব ও তিব্বতী-ব্রহ্মীয় রীতি অনুসারী রণ-কৌশলাদিও অবশ্য বিবেচ্য। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে মহাভারতের কাহিনী, কুরুক্ষেত্র রণস্থলে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত কর্তৃক 'কিরাত' ও 'চীন' সৈনিকদের নেতৃত্ব নিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হবার উল্লেখ।

নলরাজার গড় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় তিস্তা, তোরসা ইত্যাদি নদীগুলির প্রবাহধারার গুরুত্ব এবং আরও পূর্বাঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক সম্পদসমূহ যাদের এক বিশেষ পটভূমিকা রচনা করেছে ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন গতিপথ ও তার বারিধৌত উপত্যকা। এইসব বিষয়বস্তু বর্তমানে অনেকাংশেই অজ্ঞাত ও স্বভাবতঃই পুরাতাত্ত্বিকের বিস্তৃত সমীক্ষা ও পর্য্যালোচনার জন্ত প্রতীক্ষমান।
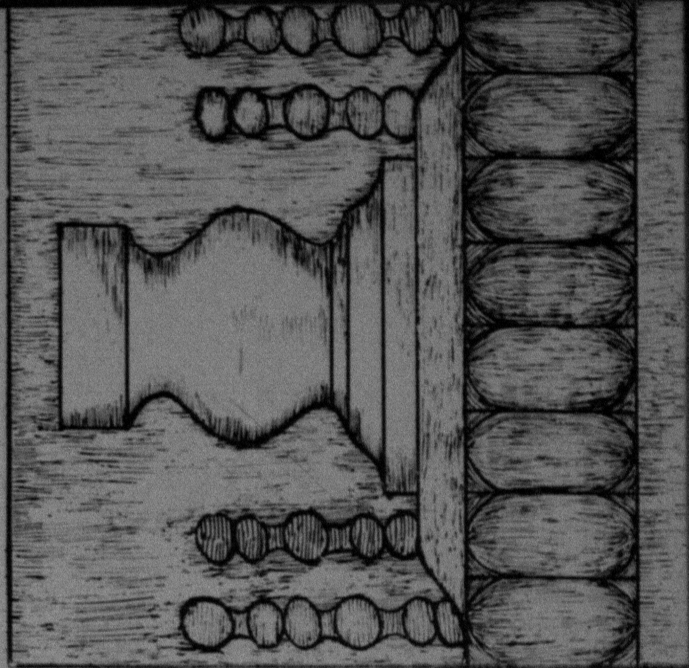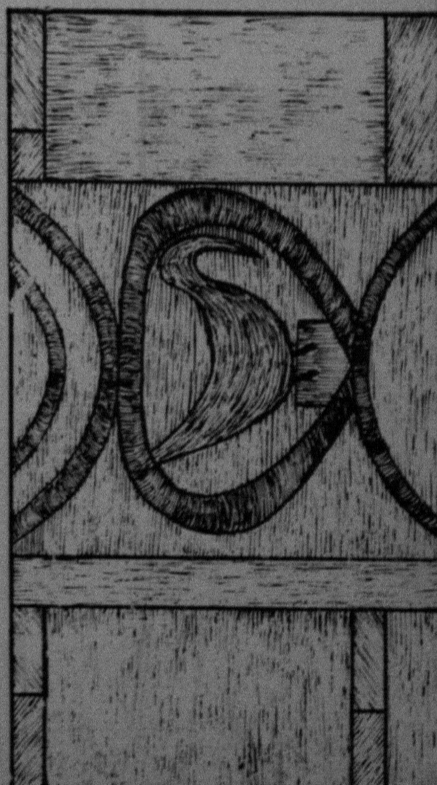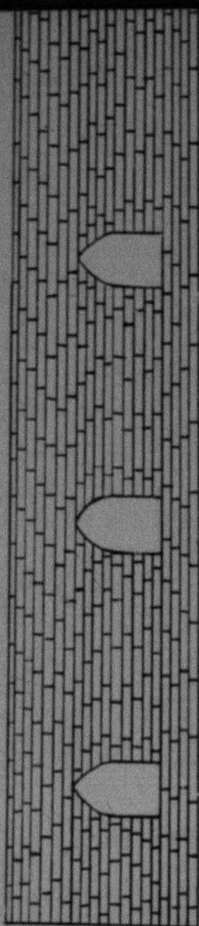
পূর্ব-হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে প্রসারিত নিবিড় অরণ্যের গভীরে ও উপত্যকাসমূহের পরিবেশে সমাধি-প্রাপ্ত অতীতের কীর্তিনিচয় আজ সামান্যই আবিষ্কৃত ও তার ক্ষীণ অথচ মহনীয় স্মৃতিটুকু বিলীয়মান কিংবদন্তীর বর্ণাঢ্য জগতে। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত নলরাজার গড় ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের পুরাকীর্তিগুলি ও অপরাপর পারিপার্শ্বিকতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য ও পটভূমিকার ভিত্তিতেই রচিত হ'য়েছে বর্তমান গ্রন্থ। বিগত দশকের অন্তর্বর্তীকালে পরিচালিত বিভিন্ন অনুসন্ধানকার্য্য এবং বিশেষতঃ ১৯৬৭ সালে নলরাজার গড় ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বনভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত এক দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের বিবরণীই অঙ্গীভূত হ'য়েছে সীমিত পরিসরে। প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিও বিবেচিত হ'য়েছে গ্রন্থটিতে।

চিলাপাতা অরণ্যে হিংস্র প্রাণী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে অনুসন্ধান ও অভিযান পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতা, একনিষ্ঠতা ও সাহসের পরিচয় দেন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের কর্মীবৃন্দ। বন্য হস্তী, ব্যাঘ্র এবং দীর্ঘ-দেহ ময়ালের ক্রীড়াঙ্গন এই অরণ্যের ঘনপত্রাবৃত তরুরাজির ছায়াময় পরিবেশে ধারাবাহিকভাবে সমীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা কোনমতেই সহজসাধ্য ছিলনা। দিবাভাগে দুর্গপ্রাকারের ভিত্তিমূলে উৎখনন পরিচালনা করলেও একাধিকবার নিশাকালে বন্যহস্তীর পদতলে ধ্বসে গেছে তার বালুকাময় আর্দ্র কিনারা। অন্তত একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটি বড় ধরনের ময়ালকে দ্রুতগতিতে আশ্রয় নিতে ভূতলে পতিত একটি জীর্ণ বৃক্ষ-কাণ্ডের অভ্যন্তরে। এছাড়া ১৯৬২ সালে এই বনভূমিতে প্রাথমিক অভিযান পরিচালনা কালে স্পষ্টতঃই দেখা গেছে গণ্ডার ও শার্দুলের পদচিহ্ন। অপরপক্ষে, মৃগদলের পরিভ্রমণ ও বিহঙ্গকুলের কলরব যেন নলরাজার গড়ের ঝিল্লীমুখরিত পরিবেশকে কখনও ক'রে তুলেছিল মনোমুগ্ধকর ও রহস্যময়।

নলরাজার গড়ে পরিচালিত বর্তমান সমীক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের অধীক্ষকদ্বয় শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী ও ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জী অভিযান-সহায়ক শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দে, প্রত্নতাত্ত্বিক রাসায়নিক শ্রীঅনিলকুমার কর্মকার, প্রত্নতত্ত্বীয় ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রত্নবস্তু সংরক্ষক শ্রীপ্রমথ-নাথ মালাকার, সারভেয়ার শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন ও ড্রাফটসম্যান শ্রী ই. ভি. সাম্পসন। এই কর্মোদ্যোগের নানা ক্ষেত্রে অসামান্য সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীভবতোষ মজুমদার, শ্রীরামনারায়ণ পাল, ৺রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, শ্রীরঞ্জিত ঘোষ ও শ্রীমিন্টু চক্রবর্তী। নলরাজার গড়ে পরিচালিত অনুসন্ধানকার্য ও বর্তমান পুস্তক মুদ্রণে বিশেষ সাহায্যদান করেছেন শ্রীকনকরঞ্জন মজুমদার ও শ্রীনির্মলকান্তি

৩০

৩১

ভৌমিক। নলরাজার গড়ে অভিযান পরিচালনাকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিকার নানা-ভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হ'য়েছে জলপাইগুড়ি জেলার শাসকবর্গ এবং স্থানীয় বন-বিভাগের কর্মীদের দ্বারা। এছাড়া, প্রয়োজনীয় সহযোগিতাদানের জন্ত মধুয়া-বাগান টি এষ্টেট ও স্থানীয় বিমান পরিবহন সংস্থার নিকটও লেখক কৃতজ্ঞ। নলরাজার গড়ে অনুসন্ধান পরিচালনার নিমিত্ত জলপাইগুড়ি জেলার তদানীন্তন সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর শ্রীডি, কে, সান্যাল যে আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা হয় না।

"অরণ্য ছায়ায় দুর্গে" গ্রন্থটির প্রণয়নে লেখক নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের অধীক্ষকদ্বয় শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী ও ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জীর নিকট। প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি বেশির ভাগই তুলেছেন শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন, অবশিষ্টগুলি অভিযান-সহায়ক শ্রীসুধীরকুমার দে কর্তৃক গৃহীত।

চিলাপাতা অরণ্যে পরিচালিত অভিযানের সাফল্য তথা নলরাজার গড়ের ঐতিহ্য উদঘাটনের নিমিত্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিকার একান্তভাবে কৃতজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগের সচিব শ্রীঅবনীমোহন কুশারী এবং উপ-সচিব শ্রীজলধর বিশ্বাসের নিকট। এতদ্ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে লেখক ঋণী এই বিভাগের তদানীন্তন সহ-সচিব শ্রীপাঁচুগোপাল আঢ্য ও বর্তমান সহ-সচিব শ্রীদুর্গাদাস ঘোষালের নিকট। এখানে সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করা চলে, যে, বিভিন্ন গবেষণা-মূলক বিবরণী প্রকাশে প্রত্নতত্ত্ব অধিকার প্রায়শঃই প্রেরণালাভ করে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগের উপ-সচিব শ্রীজলধর বিশ্বাস ও অর্থ বিভাগের সহ-সচিব শ্রীদেবব্রত সেনের নিকট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশে যথাযথ বিভাগীয় সাহায্যদান করেছেন পূর্ত ও অর্থ দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ শ্রীসুশীলরঞ্জন সরকার, শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, শ্রীশ্যামল মুখার্জী এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা।

গ্রন্থের বর্ণ-রঞ্জিত প্রচ্ছদপট এঁকেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল। অপরপক্ষে, প্রকাশনীয় সুচারু মুদ্রণ, পারিপাট্য ও সৌন্দর্যের জন্ত দায়ী কলিকাতায় "প্রেস্‌লিংকের" শিল্পী শ্রীমুরারি দত্ত।

বর্তমান গ্রন্থটির মূল্যায়ন সহৃদয় পাঠকদের নিকট সমর্পিত। জনসমাজে "অরণ্য ছায়ায় দুর্গে" যদি কোন আগ্রহ সঞ্চার করে তাহ'লে সমগ্র প্রয়াসটি সকৃতজ্ঞ অন্তরে সার্থক বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য, এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যে, সীমিত অভিযানের দ্বারা দুর্গের বিপুল অবয়বসমূহের পূর্ণ প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্ভব নয়।
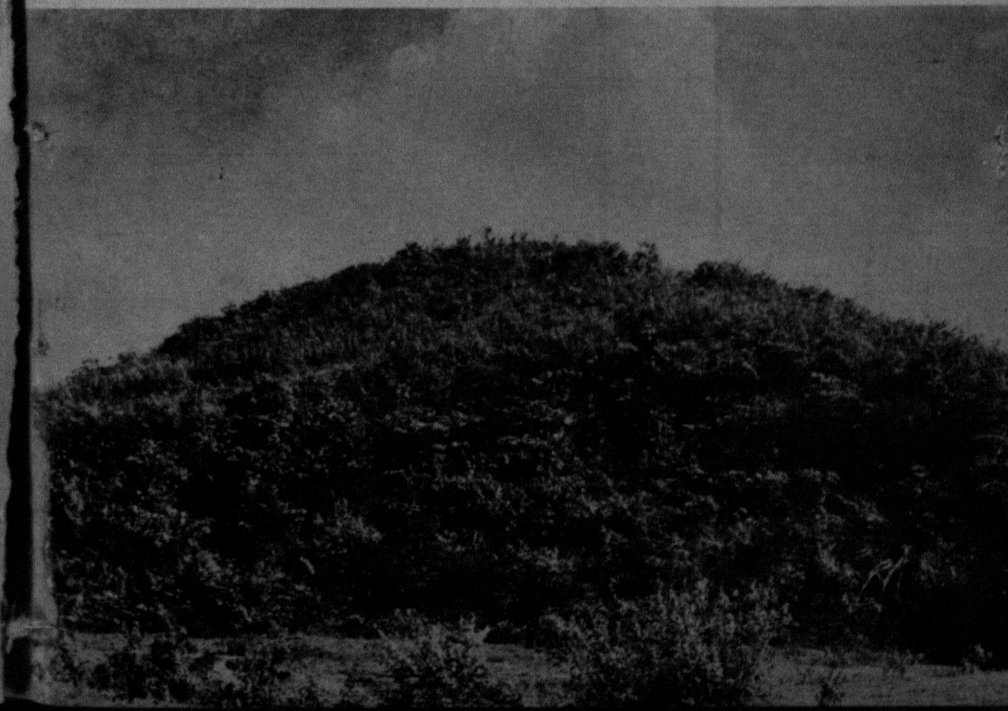
৩২

৩৩

এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ স্মরণ করিয়ে দেয় নরেন্দ্র দেব অনুদিত সুফী কবি ওমর খৈয়ামের "রুবায়েৎ", :—

স্থলতানী-প্রাসাদ যার
বিপুল আকার,
দীর্ঘ স্তম্ভ স্পর্শিত গগন।
যাহার তোরণ-দ্বারে
বারে বারে
নোয়াইত শির;
নিস্তব্ধ গভীর
আজি তার শূন্য ঘরে ঘরে
বনের কপোত একা কাতরে কুজিয়া
শুধু মরে।"

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

৩৪

৩৫
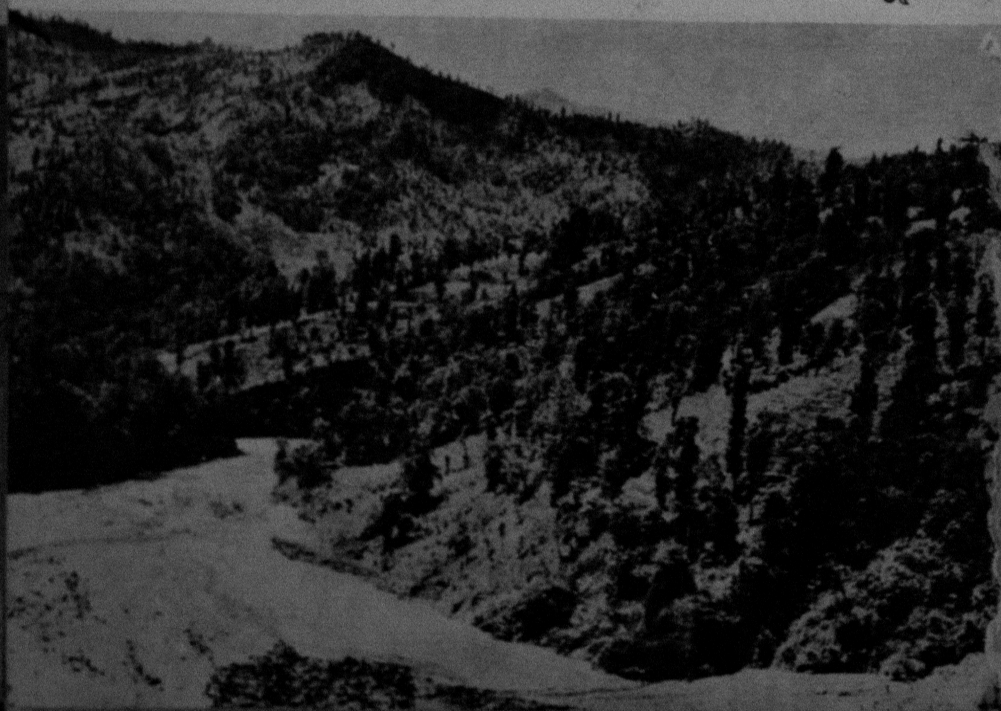
ঐতিহাসিক পটভূমিকা

প্রাচীন বাঙলার বিলুপ্ত নগরগুলির ইতিহাস প্রকৃতই রোমাঞ্চময় কারণ এগুলির উপস্থিতি জগতের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের মতই উল্লেখনীয় হ'য়ে উঠেছে প্রকৃতির নীরব পরিবেশে অথবা ভূস্তরের রহস্য-নিকেতনে। মানব-সভ্যতার প্রথম উষাকাল থেকেই এই ভূখণ্ডে বিচরণ করেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, যাদের ভ্রাম্যমান কিম্বা পুরজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যেন লিপিবদ্ধ হ'য়েছে ক্ষণিক অথবা দীর্ঘস্থায়ী অধিবসতির চিহ্নসমূহে, প্রস্তরযুগের আয়ুধনির্মাণে এবং অসংখ্য শিল্পকৃতিতে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম বাঙলার শৈল ও অরণ্যাঞ্চলে কিম্বা নয়নাভিরাম নদী-উপত্যকায় অথবা দিগন্ত-প্রসারী পাললিক প্রান্তরে যে সব অমূল্য প্রত্নসম্পদ আজ বিস্মৃতির অস্পষ্টতায় বিলীন হ'য়ে বর্ণাঢ্য কিম্বদন্তীর নাট্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। অতীত যুগের এই সব হারানো নিদর্শনগুলি যেন বাঙলার ইতিহাসের বিভিন্ন রমণীয় কিংবা আশ্চর্য্য অধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গ। দার্জিলিং হিমালয়ের নিম্নে প্রসারিত সুগভীর অরণ্য ও বালুকা-গর্ভ প্রান্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিকাও এমনিভাবে পরম-বৈচিত্র্যময় এবং আকর্ষণীয়। আজ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে এই শৈলমালা যেমন একদিকে ভক্তের নিকট দেবতাত্মা অপরদিকে তেমন আবহমান কাল থেকে বাস্তব সঞ্চয়কামী অভিযাত্রীগোষ্ঠীদের উত্তরণ-পথ। একদা একদিকে যেমন সংকীর্ণ গিরিপথগুলি ছিল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের পবিত্র বীথি অপর দিকে তেমন এগুলিই ছিল সার্থবাহদের সুবর্ণ-অলিন্দ এবং খাদ্যান্বেষীদের প্রতিশ্রুতিময় পথ। এই সব সু-উচ্চ গিরি-পথগুলির নানা ইতিবৃত্ত যেন আজ বিস্মৃতির মেঘমালায় বিলীন ও অস্পষ্ট। নবাশ্মর যুগ থেকে সংঘটিত এই সব ভ্রমণ ও বিচরণ একান্ত চিত্তাকর্ষক, কারণ তাদের ইতিবৃত্ত প্রত্যক্ষ

৩৭

৩৮
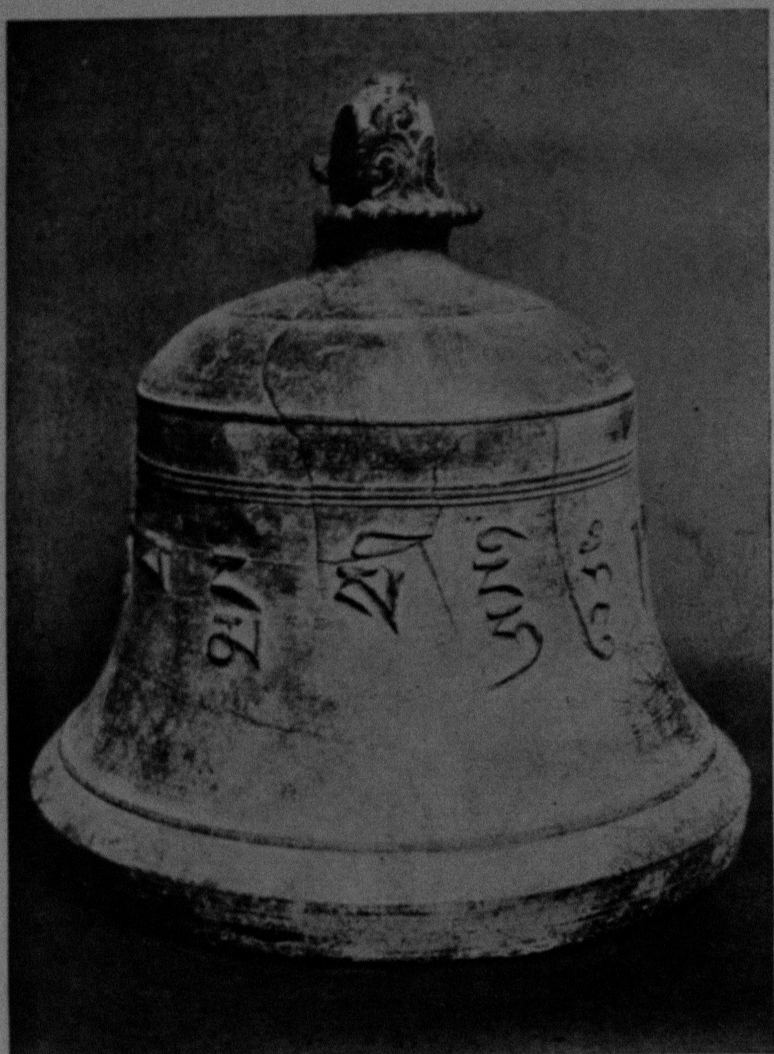
অথবা পরোক্ষভাবে বিজড়িত প্রাচীন পূর্ব্ব ও উত্তর-এশিয়ার-মানব জীবনের সঙ্গে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সুপ্রাচীন কাল থেকে হিমালয়ের উপত্যকায় ও তার সমীপে গঠিত হ'য়েছে ভারত-নিবাসীর ঐশ্বর্য্যময় অধিবসতি ও একাধিক দুর্গপুরী। অনুভূতিময় সৌন্দর্য-চেতনা ও প্রতিরোধ-বাসনা এই দুইই যেন মূর্ত হ'য়েছে এই সব নগরী ও দুর্গের ইতিবৃত্তে যা'র মোহ সৃষ্টি করে পুরাতাত্ত্বিকের চিরন্তন আগ্রহ। উত্তর বাঙলার দূরতম অভ্যন্তরে প্রসারিত চিলাপাতা অরণ্যের গভীরে অবস্থিত নলরাজার গড়ের বিপুল ধ্বংসাবশেষ সাক্ষ্য দেয় এই ধরণেরই এক প্রাচীন দুর্গের যা'র ভগ্ন প্রাকারগুলি মনে হয় আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যন্তের শান্ত্রীদের মত। ভুটান হিমালয়ের অনতিদূরে অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গ নিঃসংশয়ে গুপ্তযুগের এমন এক মহান ও আশ্চর্য্য নিদর্শন যা'র তুলনীয় স্থাপত্য সমগ্র ভারতে বিরল। গুপ্তযুগের মন্দির-স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য, সুসমঞ্জসতা ও প্রতীকবাদ একান্ত রমণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যুগের এই ধরণের প্রতিরক্ষা-স্থাপত্য আজ দুর্লভ ও বিস্মৃত। তোরসা ও বানিয়া নদীর অদূরে নির্মিত এই দুর্গটি প্রতিফলিত করে এমন এক গৌরবোজ্বল যুগকে যে কালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি ও প্রশাসন বিস্তৃতি লাভ করেছিল উত্তর-বাঙলার তরাইয়ের গভীর অরণ্যে যেখানে আজও বিচরণ করে ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের হস্তিযূথ এবং সখড়্গ গণ্ডার।

যদিও অতীতে নলরাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অভিযাত্রী, ঐতিহাসিক ও কৌতূহলীর তবুও এই পুরাকীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ণের সুশৃঙ্খল প্রকল্প প্রথম গৃহীত হয় ১৯৬৭ সালে যখন পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার-কর্তৃক এখানে প্রথম পরিচালিত হয় কয়েক মাসব্যাপী অনুসন্ধানকার্য্য। যদিও কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা শিলালিপিতে এই দুর্গের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হয়নি, তবুও এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগে রচিত "তবকাত্-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বর্ণিত বক্তিয়ার খিলজি কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের কাহিনীটি সবিশেষ

৪১

৪০
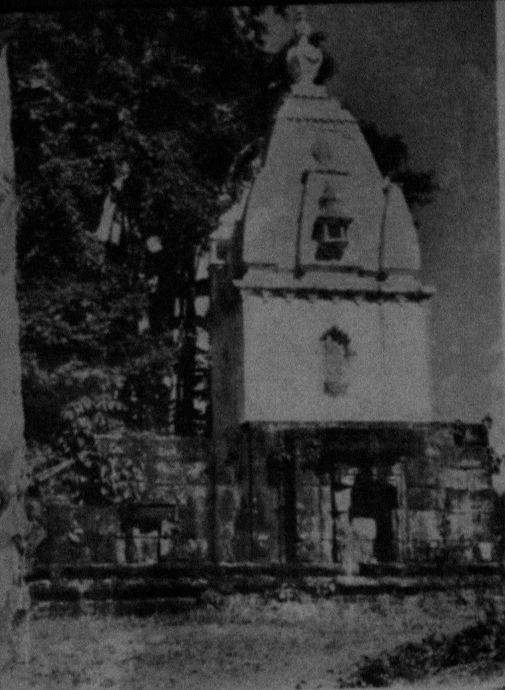
উল্লেখযোগ্য। লক্ষণাবতী-বিজয়ী এই তুর্কী বীর যে এই অভিযানে সম্পূর্ণভাবে. পরাজিত ও সহজতর ক্রমাবয় বিজয়-গৌরবে মত্ত অনুরাগীদের নিকট হৃতগৌরব হ'য়েছিলেন তা' সর্বজনবিদিত। তবকাত্‌ ই-নাসিরী থেকে অবগত হওয়া যায় যে খৃষ্টীয় ১২০৫ সালের মধ্যভাগে বঙ্গবিজেতা মুহম্মদ লক্ষ্মণাবতীর পূর্বদিকে অবস্থিত তুর্কিস্তান ও তিব্বতের পার্বত্য ভূমি জয়ের উচ্চাশা পোষণ করেন। সেই সময় তিব্বত ও লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্বর্তী স্থানে কুঁচ (কুচ), মেজ্‌ (মেচ) এবং তিহারু (থারু) এই তিনটি জাতির বাসভূমি ছিল। তাঁদের মুখাকৃতি ছিল তুর্কিদের মত এবং তাঁদের ভাষায় হিন্দ্‌ ও তুর্ক্‌ (তিব্বত) এর ভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হ'ত। এই সব জাতিগুলির এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আলি নামধারী এক ধর্মান্তরিত মেচ, মুহম্মদ ইব্‌ন্‌ বক্তিয়ারকে এই অভিযানে সাহায্য করতে রাজী হন। সিদ্ধান্ত হয় তাঁর প্রদর্শিত পথেই পরিচালিত হবে এই সামরিক অভিযান। যথাসময়ে লক্ষ্মণাবতী কিংবা দেবীকোট (পশ্চিম দিনাজপুরে অবস্থিত বাণগড অঞ্চল) থেকে মুহম্মদ যাত্রা করেন প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী সেনানীর সঙ্গে। তিনি যখন বগুরার উত্তরে করতোয়ার নিকটে বর্ধনকুটিতে (বর্ধনকোট) উপস্থিত হন তখন তাঁর সম্মুখে প্রতিবন্ধক হয় বেগমতী নামে এক বিপুল নদী। ক্রমাগত দশদিন পর্বতের অভিমুখে মুসলমান বাহিনী অগ্রসর হয় এই নদীর দক্ষিণ তীর অনুসরণ করে। এখন এই নদীর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ব্লকম্যানের সিদ্ধান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ধারণায় তবকাত-ই-নাসিরীতে বর্ণিত এই প্রশস্ত নদীটি প্রকৃত-পক্ষে করতোয়া। তিনি দেখিয়েছেন যে ১৭৮৪ সালের পূর্বে করতোয়া তিস্তার (ত্রিস্রোতা) সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। অপরপক্ষে, তিস্তা করতোয়ার পশ্চিম দিকে আত্রাইয়ের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে গঙ্গায় মিশেছিল। ডঃ হেমচন্দ্র রায়ের মতেও এই দশদিনব্যাপী অভিযান পরিচালিত হয় করতোয়া এবং তিস্তার ধার দিয়ে তিব্বতের পথে। অবশ্য, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হ'য়েছেন যে এই দশ দিনের সামরিক
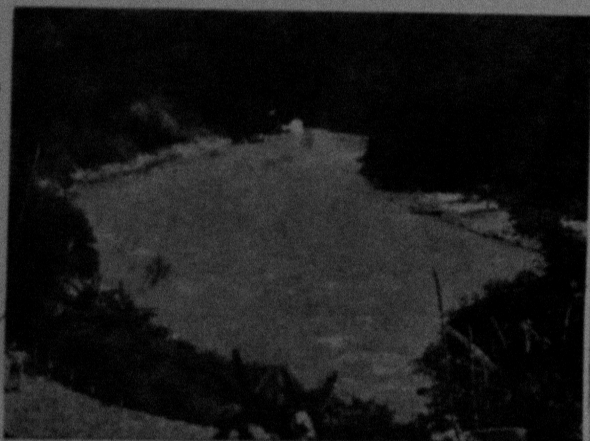
পদক্ষেপ অনুসরণ করে কামরূপের প্রত্যন্ত পথ। দশদিন অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই বক্তিয়ারের ফৌজ উপস্থিত হয় পার্বত্য প্রদেশে যেখানে ছিল কুড়িটি খিলানযুক্ত একটি প্রস্তরময় সেতু। ব্লকম্যানের ধারণায় এই সেতুটি ছিল দার্জিলিং এর নিকটবর্তী কোন স্থানে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন কারণদৃষ্টে ডঃ হেমচন্দ্র রায় অনুমান করেন যে এই খিলানের সংযোগ-পথটি এক হয় কামরূপরাজ্যের অদূরে অথবা এই রাজ্যের অভ্যান্তরেই অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, এই সেতুটি অতিক্রম করবার সময় আক্রমণকারী সেনানায়ক তাঁর দুইজন আমীরের উপর তার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই সেতু অতিক্রমের সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে কামরূপের (কামরূদ) রাজা (রায়) তাঁকে এই সময় আর অগ্রসর হ'তে নিষেধ করেন। তিনি জানান যে এই আক্রমণের পূর্বে বিপুল আয়োজনের প্রয়োজন এবং আগামী বৎসর উপযুক্ত সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত তিনিও নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু, মুহম্মদ-ইবন্-বক্তিয়ার তাঁর সুচিন্তিত সাবধান-বাণীতে কর্ণপাত না ক'রে দুর্গম পর্বতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকেন এবং ষোল দিনের দিন তিব্বতের উন্মুক্ত রাজ্যে উপস্থিত হন। বিভিন্ন জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ও উপজাতি-অধ্যুষিত এই অঞ্চলটিতে দেখা যায় কৃষি-কর্ষণের কর্মোদ্যোগ। আক্রমণকারী সেনানীরা একটি দুর্গের সমীপে উপস্থিত হয় এবং সুরু করে তাদের লুণ্ঠনকার্য্য। এই সময়ে এই দুর্গ ও নগরীর অধিবাসীরা মুহম্মদের সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেয় এবং এক ভীষণ সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় সূর্য্যোদয় থেকে সান্ধ্য-প্রার্থনার কাল পর্যন্ত। এই রণাঙ্গনে মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এছাড়া, নিশাকালে যখন সেনাপতি মুহম্মদ শুনতে পেলেন যে তাঁদের আক্রমণার্থ আরও ৫০,০০০ নির্ভীক "তুর্ক্" (তিব্বতীয়) ঘোড়সওয়ার ও তীরন্দাজ অগ্রসারী তখন তিনি অনন্যোপায় হ'য়ে অপরাপর আমীরদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁর ক্লান্ত ও পরাজিত ফৌজ নিয়ে প্রত্যাবর্তন সুরু করেন। এই ফিরবার পথটি তাঁর কাছে নিরতিশয় ভয়াবহ মনে হ'য়েছিল, কারণ পার্বত্য পথের কোথাও জ্বালানী

ও তৃণ দেখা যায়নি। স্থানীয় অধিবাসীরা এই সব জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। এই সময় পরাজিত সৈন্যগণ তাদের নিজেদের অশ্বগুলিকেই হত্যা করতে থাকে খাদ্যের জন্য। অবশেষে তারা পর্বতভূমি ত্যাগ ক'রে উপস্থিত হয় কামরূপ রাজ্যে। কিন্তু, যখন তারা সেই পূর্বের সেতুটির নিকট উপস্থিত হয় তখন দেখা গেল সেটিকে হিন্দুরা ধ্বংস করে রেখেছে। জানা গেল, প্রহরারত দুইজন আমীরের আত্মকলহ ও কর্তব্যহীনতাই এর জন্য দায়ী। যে হেতু এই স্থানটিতে নৌকার অভাবে নদী পার হওয়া সম্ভব ছিলনা, মুহম্মদ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন নিকটবর্ত্তী এক সু-উচ্চ ও সুষমাময় মন্দিরে। এই সুদৃঢ় দেউলটি অধিকার করার পর কামরূপের "রায়" প্রকাশ্যে মুসলমান বাহিনীর শত্রুতায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁর আদেশে দেশের সমগ্র হিন্দু অধিবাসী মন্দিরের চারধারে সূক্ষ্মাগ্র বাঁশ প্রোথিত করে বিপজ্জনক অবরোধ-প্রাচীর রচনা করতে থাকে। অনিবার্য্য বিপদ উপলব্ধি করে মুহম্মদ তাঁর সেনাবাহিনীকে এই বাঁশের শূল-প্রাচীর ভেঙ্গে বহির্ভূখণ্ড আক্রমণের আদেশ দেন। বহু কষ্টে অবরুদ্ধ বাহিনী এই প্রাচীর ভাঙ্গতে সক্ষম হয় এবং বাহিরের মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হয়। অতি নিকটে পশ্চাদ্ধাবনরত হিন্দু আক্রমণকারীদের প্রতিশোধ নেওয়া থেকে পরিত্রাণের আশায় তারা নদীর দিকে ধাবিত হয় ও প্রায় সকলেই সলিল-গর্ভে বিনষ্ট হয়। কেবলমাত্র মুহম্মদ ইবন্ বক্তিয়ার এবং কম বেশী একশত সেনানীর প্রাণ রক্ষা হয়। "মেজ্" গোষ্ঠীয় আলীর আত্মীয়দের সাহায্যে অবশেষে কোনক্রমে বঙ্গ-বিজেতা মুহম্মদ ভগ্নহৃদয়ে দেবীকোটে উপস্থিত হন ও অশেষ নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হন। শোনা যায়, বিনষ্ট সৈনিকদের শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের ক্রন্দনরোলে ও নিন্দায় আক্রান্ত হ'য়ে মুহম্মদ মুক্ত স্থানে অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। তিব্বত আক্রমণের ফলেই তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের সমাধি রচিত হয়। ব্লকম্যানের ধারণায় এই আক্রমণের

পশ্চাতে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নির্বুদ্ধিতা ও দুঃসাহস। তাঁর এই মতটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"It is difficult to say what motives Muhammad *Bakht-yar* had to invade Tibbat. It was perhaps, as Minhaj says, ambition, but if we consider how small a part of Bengal was really in his power, his expedition to Tibbat borders on foolhardiness".

ডঃ হেমচন্দ্র রায়ের মতে এই প্রসঙ্গে সেই যুগের বাংলা ও তিব্বতের মধ্যে রচিত বিস্তৃত বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্ব উল্লেখনীয়। তিনি মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে সে যুগে ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ও তিরহুতের মধ্যে অন্যূন পঁয়ত্রিশটি পথে তিব্বত যাওয়া যেত। এই বাণিজ্যের পণ্যবস্তুগুলির অন্যতম ছিল স্বর্ণ, তাম্র, সীসক, কস্তুরী অথবা মৃগনাভি. চামরী গাভীর লেজ, মধু, লবণ, বাজ পাখী এবং পার্বত্য ঘোটক। ডঃ রায়ের ধারণায়, এই বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণ অথবা লুণ্ঠন ছিল উপরে বর্ণিত তিব্বত-অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ("The motive behind the expedition was probably to plunder and if possible control the rich commercial marts of Tibet")। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ধারণা-গুলি আকর্ষণীয় হ'লেও তবকাত্-ই-নাসিরীর বিবৃতি আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। অভিযানের বর্ণনায় এমন কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য নেই যা' থেকে মনে হ'বে উত্তুঙ্গ শৈলমালা অতিক্রম করে মুসলমান বাহিনী তিব্বতের তুষারাবৃত উপত্যকায় উপস্থিত হ'য়েছিল। তা' ছাড়া উল্লেখনীয় যে মাত্র এক পক্ষকাল অগ্রসর হ'য়ে মুহম্মদ দেবীকোট থেকে এক দুর্গপুরীর সমীপে লুণ্ঠনকার্য্য সুরু করেন। সর্বদাই এই সেনা-বাহিনী ছিল কামরূপ সাম্রাজ্যের অদূরে। এমতাবস্থায় এমন ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে অভিযাত্রী সেনাদল নিম্ন-হিমালয় অঞ্চলে কোন নদী পার হ'য়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয় শৈল ভুটানের অভিমুখে।

এখানে অবশ্য স্মরণ করা যেতে পারে যে অতীতে বর্তমান ভুটানের অংশ-বিশেষ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষ্ণু পুরাণের বর্ণনানুযায়ী কামাখ্যা মন্দিরের চারপাশে শত যোজনব্যাপী (৪৫০ মাইল) স্থানে বিস্তৃত ছিল কামরূপ রাজ্য। স্যার এস. এ. গেইট অনুমান করেছেন, যে, বিভিন্ন অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও প্রাচীন কামরূপ রাজ্য একদা পূর্ববঙ্গ, আসাম ও ভুটানের অনেকখানি অংশ জুড়ে প্রসারিত ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতে বর্ণিত আছে, যে, প্রাগজ্যোতিষ নৃপতি মহাপরাক্রান্ত ভগদত্ত "কিরাত" ও "চীন" নামধেয় ম্লেচ্ছ সেনাবাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবকাত্-ই-নাসিরীর বর্ণনা পাঠ করে স্বভাবতঃই প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে মুসলমান বাহিনী তাদের শেষ ছয় দিনের অভিযান সম্পাদিত করেছে দুয়ার অরণ্যের ধার ঘেঁষে। সমগ্র ঘটনাটি এইভাবে বিচার করলে নলরাজার গড়ের গুরুত্ব অনুভূত হবে এক অবিস্মরণীয় শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে, যখন সমগ্র ভারতে সূচিত হ'তে চলেছে প্রকৃত মধ্যযুগ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই দুর্গপুরীর বিশাল আয়তন আক্রমণকারীদের মনে সর্বদাই হতাশার সৃষ্টি করেছে। যে সু-উচ্চ মন্দিরের চত্বরে মুহম্মদের পরাজিত সৈন্যদল আশ্রয় নিয়েছিল এবং যে নদীতে তারা বিনষ্ট হয় তাদের পরিচয় আজ অজ্ঞাত, যদিও জল্পেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনতর স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য ও তিস্তার খরস্রোত উল্লেখণীয়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক মন্দিরটি পুনরায় নির্মিত হবার পূর্বেও যে এই মন্দির ভক্তজনকে বিশেষ আকর্ষণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই স্থান-নিরূপণে আরও তথ্যের প্রয়োজন সন্দেহ নেই। এখানে অবশ্য স্মরণ করা যেতে পারে যে জল্পেশ্বর মন্দিরের পরিমণ্ডলে দেখা যায় খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর শৈলীতে খোদিত একাধিক শিলামূর্ত্তি। অপর পক্ষে, মন্দিরের অদূরে তিস্তার পূর্বদিকে বটেশ্বর ও পূর্বদহে আবিষ্কৃত হ'য়েছে প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বালুকা-প্রস্তর নির্মিত বটেশ্বর দেউলের কারুকর্ম, নির্মাণ-রীতি ও পল্লব-মাল্যখোদিত

স্তম্ভসমূহ যেমন গুপ্তযুগের স্থাপত্য-শৈলীর সাক্ষ্য বহে, তেমন পূর্বাহ্নের ধ্বংসাবশেষে পাল ও কোচ শিল্পের রূপায়ণ দেখা যায়।

নলরাজার গড়ের প্রাচীনত্ব আকর্ষণীয় হ'লেও বিস্ময়কর নয়, কারণ উত্তর বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল একদা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি হরিষেণ বিরচিত সুবিখ্যাত "এলাহাবাদ প্রশস্তি" থেকে অবগত হওয়া যায় যে তাঁর "প্রচণ্ড শাসনের" নিকট অবনত ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের সীমান্ত রাজ্যগুলি এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। পূর্ব-ভারত ও হিমালয়ের যে সব রাজ্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিল তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১। সমতট। পূর্ব-বঙ্গে সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রসারিত এক রাজ্য। রাজধানী সম্ভবতঃ কর্ম্মান্ত (কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কাম্‌তা)।

২। ডবাক। এই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থান এখনও নির্ণীত হয়নি। পণ্ডিত ফ্লিটের ধারণায় প্রাচীন ঢাকার নাম ছিল ডবাক। অপরপক্ষে, ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে ডবাকের প্রকৃত অবস্থান ছিল উত্তরবঙ্গে বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায়। কর্ণেল জেরিণির গবেষণা অনুযায়ী এই রাজ্যটি ছিল উত্তর ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত। কে. এল. বড়ুয়ার ধারণায় আসামে কোপিলী নদীর উপত্যকার প্রাচীন নাম ছিল ডবাক। যদিও এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন, ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতটি অন্যান্য সিদ্ধান্তের মতই কিছুটা প্রণিধানযোগ্য। ফ্লিটের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ডবাক ও ঢাকা নামদ্বয়ের সাদৃশ্যের উপর। এই শ্রেণীর যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখনীয় জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুবিখ্যাত জলঢাকা নদীর অবস্থান। এই নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ডাউকামারী নামটির প্রকৃত তাৎপর্য্যও গবেষণার আলোকে বিচার্য্য। ভিন্সেণ্ট স্মিথের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করবার প্রয়াস করেছেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। এর প্রধান কারণ, দামোদর তাম্রপট্টসমূহ

থেকে অবগত হওয়া যায়, যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল খৃষ্টীয় ৪৪৩ থেকে ৫৪৩ পর্যন্ত এবং এই অঞ্চলটি ক্রমান্বয়ভাবে শাসিত হ'য়ে এসেছে একজন সামন্তরাজের ('উপরিক') দ্বারা। কিন্তু, এই যুক্তির দ্বারা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কোন ক্ষুদ্রতর আয়তনবিশিষ্ট উত্তরবঙ্গীয় রাজ্য জয়ের সম্ভাবনাকে অবিশ্বাস করা চলে না।

৩। নেপাল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উত্তর-সীমান্তে প্রসারিত পার্বত্য রাজ্য। বর্তমানকালের মতই সে যুগেও এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল মর্য্যাদাপূর্ণ।

৪। কর্তৃপুত্র। সম্ভবতঃ এই রাজ্যের পরিচয় আজ বহন করছে জলন্ধর জেলায় অবস্থিত কাতারপুর এবং কুমায়ুন রাজ্যের অন্তর্গত কতুরিয়া অথবা কত্যুর। এছাড়া, হয়ত প্রাচীন কর্তৃপুত্রের অন্তর্গত ছিল গাড়োয়াল ও রোহিলখণ্ড।

বর্তমান জ্ঞানের পরিধির মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য, যে, "এলাহাবাদ অনুশাসনে" বর্ণিত আছে অপরাপর উপজাতিসমূহ এবং বৈদেশিক নৃপতিদের মধ্যে শক-মুরুণ্ডগণও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন অনুমান করেন, যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাঙলা দেশ কুষাণ-রাজন্য শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তাঁর এই অনুমানের প্রধান কারণ টলেমীর বর্ণনা, যা, থেকে জানা যায় যে, এই যুগে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য ভারতে ('প্রাসিয়াকে') অনিশ্চিত সীমান্তবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে মরুণ্ডাইগণ শাসন করত। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেনের মন্তব্য আংশিকভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :

"In Ptolemy's time upper Bengal was part of an extensive territory including Gorakhpur under the government of the Maroundai. They may have originally been Viceroys under Kushan suzerains but seem to have taken the earliest opportunity of carving out an independent principality with the decline of the imperial supremacy of their masters.

Eastern India, as understood in those days, extended downwards to the Bay of Bengal, and was probably broken into new administrative units under the Kushans, which may account for Ptolemy's description of the Prasiake as a territory of 'very limited dimensions and of uncertain boundaries'. (*Some Historical Aspects of The Inscriptions of Bengal*, Calcutta University, 1942, p. 198 দ্রষ্টব্য)।

সম্রাট কুমারগুপ্তের জীবদ্দশায় ও পরবর্ত্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য যে বৈদেশিকদের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুবিখ্যাত 'ভিতারী' ও 'জুনাগড়' অনুশাসনদ্বয়ে। খ্রীষ্টীয় ৪৫৮ সালে উৎকীর্ণ 'জুনাগড় অনুশাসন' থেকে অবগত হওয়া যায় যে স্কন্দগুপ্ত একদা 'ম্লেচ্ছ' আক্রমণের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই ম্লেচ্ছগণ উল্লিখিত হ'য়েছে আক্রমণকারী পুষ্যমিত্র ও হূণদের সমপর্য্যায়ে। এ থেকে স্বভাবতঃই আভাষ পাওয়া যায় আক্রমণকারী ম্লেচ্ছদের সামরিক শক্তির অথবা বলিষ্ঠতার। যদিও কখনও অনুমান করা হয় যে এই ম্লেচ্ছ ও হূণগণ অভিন্ন, স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করলে এই মতটি হয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনও সম্ভব যে এই "ম্লেচ্ছ" আক্রমণ সংঘটিত হ'য়েছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পটভূমিকায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহাভারতে বর্ণিত আছে, যে প্রাগ্‌-জ্যোতিষ-রাজ ভগদত্ত 'কিরাত' ও 'চীন' নামধারী ম্লেচ্ছ সেনাবাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। এছাড়া, কামরূপের অন্তর্গত বড়গাঁওয়ে আবিষ্কৃত একটি অনুশাসনে রাজা শালস্তম্ভকে "ম্লেচ্ছাধিনাথ" আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। রাজা শালস্তম্ভ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ আসামে রাজত্ব করেন আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬৫০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত। রত্নপালের 'বড়গাঁও অনুশাসন' থেকে অবগত হওয়া যায় যে শালস্তম্ভের একুশজন বংশধরদের শাসনকালের পর প্রজাগণ ব্রহ্মপালকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং কামরূপের পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশও অবশ্য দাবী করে যে তাঁদের

উৎপত্তি ভগদত্তের পূর্ব-পুরুষ নরক থেকে। এই প্রসঙ্গে নিয়ে উদ্ধৃত ডঃ হেমচন্দ্র রায়ের মতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,

"They were right, however, in tracing their descent from Bhagadatta, the lord of the Mleccha Cinas and Kiratas, in as much as they appear to have belonged to that great hive of Mongolian peoples which lies in the north, and east, of the Indian Sub-continent." (*Dynastic History of Northern India*, Vol. I, Calcutta University, 1931 p 249).

ডঃ হেমচন্দ্র রায়ের ধারণায় খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শান জাতির শাখা অহোমদের আক্রমণ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্ম-দেশীয় আক্রমণ এই ধরণেরই এক পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তের পরিচায়ক। তাঁর মতে আসাম এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অধিবাসীদের দেহ-সংগঠনে প্রতিফলিত মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য এই সিদ্ধান্তকে সপ্রমাণিত করে। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে, যে, কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মূল গুপ্তযুগের পরবর্ত্তীকালে 'ম্লেচ্ছ' নামটি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পার থেকে আগত আক্রমণকারীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হ'য়েছে। যথা, চাহমান দ্বিতীয় ভর্তৃবড়্ডের 'হানসোট লিপি'তে (বিক্রমাব্দ ৮১৩ খ্রীষ্টীয় ৭৫৬) উল্লিখিত "ম্লেচ্ছ"গণ সম্ভবতঃ বালুচজাতীয়। ডি. আর. ভাণ্ডারকারের মত সমর্থিত হ'লে এই "ম্লেচ্ছ" সেনাবাহিনী গুর্জররাজ প্রথম নাগভট (নাগাবলোক) কর্তৃক পরাজিত হ'য়েছিল (*Indian Antiquary, 1911*)। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে, প্রাচীনতর কালে "ম্লেচ্ছ" নামটি পূর্ব-ভারতীয় 'অনার্য্য' গোষ্ঠী সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য ছিল।

সাধারণতঃ ঐতিহাসিকদের ধারণায় 'জুনাগড় লিপি'তে উল্লিখিত ম্লেচ্ছগণও 'ভিতারী অনুশাসনে' বর্ণিত আক্রমণকারী হূণজাতি অভিন্ন। কিন্তু, এই মত হয়ত সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ সেই ক্ষেত্রে তা'হলে দ্বিধা-দ্বিধায় মেনে নিতে হয় যে ম্লেচ্ছরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করতে প্রয়াসী হ'য়েছিল। এ বিষয়ে

সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অধ্যায়ে পূর্ব-সীমান্তেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করা চলে, যে 'দামোদর তাম্রপট্টে' উল্লিখিত আছে, সম্রাট কুমারগুপ্ত সামন্ত-রাজ চিরাতদত্তকে (=কিরাতদত্ত) পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। 'দামোদরপুর তাম্রপট্ট'সমূহ থেকে জানা যায়, যে, চিরাতদত্তের পর জয়দত্ত ও ব্রহ্মদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। তাঁদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত "মহারাজ" উপাধিটি নিঃসংশয়ে বর্ধিত প্রশাসনিক ক্ষমতা ও গৌরবের পরিচায়ক। এছাড়া, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত যে তাম্রপট্টে চিরাতদত্তের নাম পাওয়া যায়, সেই তাম্রপট্টেই একজন বিষয়পতির নাম উল্লিখিত হ'য়েছে যিনি স্বভাবতঃই উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত পঞ্চনগরীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন সম্রাটের প্রত্যক্ষ অভিপ্রায়ে।

কুমারগুপ্তের দ্বারা প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রাগুলির মধ্যে অশ্বারোহী সম্রাট কর্তৃক তরবারিহস্তে গণ্ডার-নিধন চিত্রযুক্ত এক শ্রেণীর মুদ্রা সম্ভবতঃ নিম্ন-হিমালয় পর্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাক্ষ্য দেয়। সখড়্গ গণ্ডারের সঙ্গে সম্রাটের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম যেন কোন এক নাটকীয় সংঘাতকে বিবৃত করে। স্বভাবতঃই, কোন কোন ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের রোমান সম্রাটদের চেয়ে গুপ্ত সম্রাটদের ব্যক্তিগত শৌর্য্য অধিকতর প্রকাশিত। কুমারগুপ্ত কর্তৃক প্রবর্তিত উল্লিখিত স্বর্ণ মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে মকর-বাহিনী গঙ্গাদেবীর চিত্র দেখা যায়। এই চিত্র দেখে অনুমান করা যায় যে প্রকৃতই যদি এই মুদ্রা কোন যুদ্ধের স্মৃতি বহন করে তবে তা' সংঘটিত হ'য়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই সামরিক সংঘর্ষের ঘটনাস্থল গণ্ডার-অধ্যুষিত নেপাল-রাজ্যের নিম্নাঞ্চল অথবা আসাম-রাজ্য। এই সব সম্ভাবনার পরি-প্রেক্ষিতে স্বভাবতঃই উপলব্ধি করা যাবে নলরাজার গড়ের অপরিমেয় গুরুত্ব। এমনও হ'তে পারে, ম্লেচ্ছ-আক্রমণের পরিচয় বহন করে কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় প্রদর্শিত গণ্ডার-নিধন চিত্র। এখানে উল্লেখনীয়

যে, টিলাপাড়া ও জলদাপাড়ার প্রাচীন অরণ্য অদ্যাবধি সবচেয়ে গণ্ডারের জন্য খ্যাত। নিরপেক্ষ গবেষণার জন্য অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে অতীতে নিম্নবঙ্গে সুন্দরবন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলেও গণ্ডারের প্রাদুর্ভাব ছিল। চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে কুষাণ শৈলীতে রূপায়িত গণ্ডারের চিত্র-সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এম. ভি. সোহনীর মতে কুমারগুপ্ত কর্তৃক গণ্ডার শিকারের ঘটনাটি উত্তর বিহারে বৈশালীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। একটি মূল্যবান প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"It is more probable that Kumaragupta's hunt of rhinoceros took place in North Bihar jungles adjoining the Chaitwan in Nepal, not far away from Vaisali, than in distant Assam. A ruler of Pataliputra would have found this more convenient." (*"Khadgatrata" Coins of Kumaragupta I*, JNSI, XVII).

মনুসংহিতা, পারস্কর গৃহ্যসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে সোহনী প্রমাণ ক'রতে প্রয়াসী হ'য়েছেন, যে এই গণ্ডার শিকারের সঙ্গে শ্রাদ্ধকর্মের সম্পর্কে থাকা সম্ভব। গণ্ডারের খড়্গ, মাংস ও শোণিতের পবিত্রতা-হেতু এই মৃগয়া অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। সোহনীর এই মতটি আকর্ষণীয় হ'লেও হয়ত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মুদ্রাপৃষ্ঠের লিপি ও অভিব্যক্তি "ভর্তা খড়্গত্রাতা কুমারগুপ্তো জয়ত্য (নিসম)" কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্তমান। বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতো এর অর্থ "চিরবিজয়ী ত্রাতা কুমারগুপ্ত যিনি খড়্গের দ্বারা ত্রাণ করেন।" কোন কোন মুদ্রাতত্ত্ববিদের ধারণায় এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ, "চিরবিজয়ী ত্রাতা কুমারগুপ্ত যিনি গণ্ডার থেকে রক্ষা করেন (খড়্গ-ত্রাতা) তরবারির দ্বারা (খড়্গেনত্রাতা)" মুদ্রার বিপরীত পৃষ্ঠে "শ্রীমহেন্দ্র খড়্গঃ" নামটিও কোন আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করেছে। লক্ষ্ণৌ চিত্রশালার

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ (Curator) মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এস. এম. নাগরের ব্যাখ্যায় মুদ্রায় অঙ্কিত গণ্ডারের চিত্রকে জলাভূমিপূর্ণ আসামের অরণ্যাঞ্চল অধিকারের প্রতীক হিসাবেও গ্রহণ করা যায়। তাঁর মতে প্রথম কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ প্রকৃতই কোন কোন সময়ে এই অরণ্যসমূহে গণ্ডার শিকারে ব্যাপৃত ছিলেন (*A Rhinoceros Slayer Type Coin of Kumaragupta I, JNSI, vol. XI June, 1949 Part I, pp. 7-8*)। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক বিবেচনায় অনুমান করা যেতে পারে যে কুমারগুপ্ত কর্তৃক অঙ্কিত উল্লিখিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এবং উপরিক চিরাতদত্তকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দায়িত্ব প্রদান হয়ত প্রাচ্য ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বাঙলায় গুপ্তসম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রাগুলির মধ্যে কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রাই আবিষ্কৃত হ'য়েছে অধিক সংখ্যায়।

সম্রাট কুমারগুপ্তের জীবদ্দশায় যে বৈদেশিক আক্রমণের সূত্রপাত হয় তারই দুর্বারতা পরিলক্ষিত হয় তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে। একথা সর্বজনবিদিত, যে এই সময় হূণ এবং পুষ্যমিত্রগণ (ভিন্ন মতে "যুদ্ধে অমিত্রাংশ্চ") প্রায় যুগপৎ গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে অগ্রসর হয় কিন্তু স্কন্দগুপ্ত ও বহুযুদ্ধবিজয়ী গুপ্ত বাহিনীর নিকট তাদের বিপর্য্যস্ত ও পরাভূত হ'তে হয়। প্রায় একই সময়ে কিন্তু হূণদের অপর এক শাখা রোমান্ সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ-প্রাকার চূর্ণ করতে সক্ষম হয়। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ রোমান্ সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্ম উত্থানের নিমিত্ত রাজকীয় অসহিষ্ণুতা-জনিত আত্মবিরোধ। এছাড়া, এই যুগে পশ্চিমী সাম্রাজ্যের সিজার ও বিত্তশালী রোমানদের অহর্নিশ ক্ষমতা লাভের প্রতি আগ্রহ এবং বিলাসপ্রিয়তা দুর্বল করে তুলেছিল রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিকে। অপর-পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে ও মৃগয়ায় গুপ্ত সম্রাটদের নির্ভীকতা ও মল্লযোদ্ধা-সুলভ নিষ্ঠা সে যুগে ঐক্যবদ্ধ আর্য্যাবর্ত্তের রাজশক্তিকে এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল যা'র সম্মুখে বারংবার দলিত হ'য়েছিল হূণবাহিনী।

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণ আক্রমণ এতই প্রবল হ'য়ে ওঠে, যে, তাঁকে সীমান্তে 'গোপ্তৃ' নামধারী এক বিশেষ শ্রেণীর শাসক নিয়োগ করতে হয়। এই 'গোপ্তৃ' শাসিত অঞ্চলগুলির কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না পাওয়া গেলেও নলরাজার গড়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। 'পরবর্ত্তী গুপ্ত সম্রাটদের' (Later Guptas) রাজত্বকালেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। 'অফসড় অনুশাসন' থেকে জানা যায় যে পশ্চিমে মৌখরি বাহিনী এবং পূর্বে কামরূপের বর্মনদের দ্বারা বেষ্টিত হ'য়ে এই গুপ্ত সম্রাটগণ নিজরাজ্য রক্ষায় সচেতন হ'য়ে ওঠেন। সম্রাট মহাসেন গুপ্ত ও সম্ভবতঃ কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মনের মধ্যে এক যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় 'অফসড় অনুশাসনে'। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে দুই সৈন্যবাহিনী শক্তি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং জয়লাভ করেন মহাসেন গুপ্ত ("শ্রীমৎ-সুস্থিতবর্ম্ম-যুদ্ধ-বিজয়-শ্লাঘা-পদ আঙ্কম্ মুহুর-যস্য-আদ্যাপি....লৌহিত্যস্য তটেষু....স্ফীতম যশো গিয়তে")। এই যুদ্ধের প্রকৃত তারিখ না জানা গেলেও অনুমান করা স্বাভাবিক যে খৃষ্টীয় ৫৫৪ সালের কিছু পূর্বে মহাসেন গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজ্যকাল দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এখানে উল্লেখনীয় যে সুস্থিতবর্মনের পুত্র সিংহাসন লাভ করেন আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬০৬ সালে। মহাসেন গুপ্তের পূর্বে অবশ্য মান্দাসোর-অধিপতি যশোধর্মন লৌহিত্য পর্য্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। মালব সংবৎ ৫৮৯ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫৩২-৩৩ সালে উৎকীর্ণ 'মান্দাসোর লিপি' থেকে জানা যায় যে তিনি হূণ সম্রাট মিহিরকুলকে পরাভূত করেন। তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মহেন্দ্র পর্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই অনুশাসনে এমন দাবী করা হ'য়েছে, যে তাঁর শাসিত রাজ্যের ন্যায় সুবৃহৎ ভূভাগ ইতিপূর্বে গুপ্ত সম্রাটগণ অথবা হূণদের দ্বারা কখনও অধিকৃত হয়নি। বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে জনেন্দ্র যশোধর্মনের এই সাফল্যের গুরুত্ব অসাধারণ কারণ, 'মান্দাসোর অনুশাসনে' বিবৃত হ'য়েছে যে, তাঁর সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাসেন গুপ্তের পূর্বে এই দিগ্বিজয়ীও যেন

প্রাচ্য সীমান্ত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অতিশয়োক্তির প্রশ্ন উত্থাপন না করলে মনে হয় তাঁর সাম্রাজ্য অন্তত ধুবড়ী পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই সব ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে নলরাজার গড়ের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

খৃষ্টীয় ৫৪৩-৪৪ সালে উৎকীর্ণ দামোদরপুরের সর্বশেষ তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে এই সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন কোন এক গুপ্তবংশীয় "মহারাজাধিরাজের" অধীনে ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণায় এই "মহারাজাধিরাজ" ছিলেন ভানুগুপ্ত, কিম্বা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, কিম্বা "পরবর্ত্তী গুপ্ত" বংশীয় আদিত্যসেনের কোন বংশধর। এখানে স্মরণ করা চলে যে অতীতে নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য পূর্ব-ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লিখিত আছে যে বালাদিত্য (বালাখ্য) ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত (কুমারাখ্য) পূর্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"বালাখ্য নাম সৌ নৃপতির ভবিতা পূর্ব্ব দেশকঃ
তস্যপরেণ নৃপতিঃ গৌড়ানাম প্রভবিষ্ণবঃ
কুমারাখ্যো নামতঃ প্রোক্তা সো'পির অত্যন্ত ধর্মবান।"

(গণপতি শাস্ত্রীকর্তৃক অনুদিত)

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন ত্‌সাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কোন "বালাদিত্য" স্বৈরাচারী হূণ সম্রাট মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তবে সেই হূণ-বিজয়ী বালাদিত্য ও নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য অভিন্ন কিনা সেই বিষয়ে এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা-গুলিতে সম্রাটের ধনুর্বাণধারী মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ও বিস্তারিত গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে "নলরাজা" ও "নরসিংহ" নামদ্বয়ের বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

গুপ্ত সম্রাটদের পতন ও গৌড়াধিপ শশাঙ্কের জীবনকাল সমাপ্ত হ'লে বঙ্গদেশে প্রকৃতই "মাৎস্যন্যায়" অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে 'খালিম-

পুর অনুশাসন' ও লামা তারানাথের বিবৃতি সর্বজনবিদিত। পাল সম্রাটদের শাসনকালে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙলার ঐক্য ও তৎসঙ্গে এক নবীন প্রাচ্য-ভারতীয় সাম্রাজ্য। এই যুগে এক বলিষ্ঠ পুনরুত্থানের সংকেত পাওয়া যায় মহারাজ ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে। একটি গরুড় স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রশস্তি-গাথা থেকে জানা যায় যে সম্রাট দেবপালের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ("আ-রেবা-জনকান-মতজ্জ...আ-গৌরী-পিতুর-ঈশ্বর-এন্দু-কিরণৈঃ")। দেবপালের রাজত্বকালের তেত্রিশতম বৎসরে উৎকীর্ণ 'মুঙ্গের অনুশাসনে' বর্ণিত আছে, যে, তিনি "কম্বোজ" রাজ্যে সৈন্য পরিচালনা করেন। তাঁর সেনাবাহিনীর তরুণ অশ্বগুলি অবশেষে তাদের সঙ্গিনীদের খুঁজে পায় ("কম্বোজেষু চ যস্য বাজি যুবভির-ধ্বস্তান্য-রাজ-ঔজসো হ্রেষা-মিশ্রিতা-হারি-হ্রেষিতে রবাঃ কান্তাশ-চিরং বীক্ষিতাঃ")। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রায় একমত যে, এই কম্বোজগণ ছিল মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভুক্ত। নেপালীয় বর্ণনায় অবশ্য তিব্বত ও কম্বোজদেশ অভিন্ন। এই বর্ণনানুযায়ী কম্বোজ ভাষাই তিব্বতের ভাষা। প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে, দেবপাল কর্তৃক বিজিত কম্বোজদেশ ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কম্বোজ এক নয়। তিব্বতীয় পুঁথি 'পাগ-সাম্-জোন্-সাং' এ দুইটি কম্বোজের উল্লেখ আছে, একটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, আরেকটি অবিভক্ত বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে প্রসারিত লুসাইয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। 'মুঙ্গের অনুশাসনে' উত্থাপিত কম্বোজদেশের প্রসঙ্গে সর্বাধিক আকর্ষণীয় অশ্ব-সমূহের চকিত বর্ণনা। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, যে, অতীত-কালে উত্তরবঙ্গে ভুটানী ঘোড়ার আমদানী হ'ত। এই পার্বত্য অশ্ব ও অপরাপর সামগ্রার এক অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল রঙপুরে।

১৮৩৯ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ক্যাপ্‌টেন আর. বোয়ালো. পেম্বারটনের (Capt. R. Boileau. Pemberton.) বিবরণীতে লিখিত আছে যে এই সময় উত্তরবঙ্গে ভুটানের একশত পার্বত্য ঘোটকের মূল্য ছিল ৩৫০০৲ টাকা, অর্থাৎ এক একটির মূল্য ছিল ৩৫৲ টাকা। এমতাবস্থায়

স্বভাবতঃই মনে হয়, যে, 'যুদ্ধের অনুশাসনে' প্রদত্ত সামরিক অশ্বের বিবরণীটি আরও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। পেম্বারটনের গ্রন্থে ভুটানী অশ্বসম্বন্ধে খুঁটিনাটি বর্ণনাগুলি আকর্ষণীয় ও কৌতূহল-প্রদ। তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যে এই অশ্বগুলি সওয়ার বাহিনীর ঠিক উপযুক্ত না হ'লেও বিপদসঙ্কুল পর্বতগাত্রে ও খাড়াই অঞ্চলে তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা অতুলনীয়। এছাড়া এই ঘোড়াগুলির জন্য ব্যবহৃত দুই প্রান্ত উঁচু করা জীনগুলির তিনি খুব প্রশংসা করেছেন। এই জীনগুলিতে আরোহণ করে খাড়াই উৎরাই পার হওয়া সুবিধাজনক ছিল' ভুটানের ঘোড়াগুলিকে অবশ্য সাধারণতঃ ঘন্টায় দেড় থেকে দু'মাইল গতি-বেগের বেশী ছোটানো হ'তনা। পেম্বারটন একবার এইরকম একটি ঘোড়াকে তার ভারী সওয়ার নিয়ে আট-ন' হাজার ফুট উঁচু গিরি-চূড়ায় আরোহণ করতে দেখেছিলেন। তবে তিনি এই ঘোড়াগুলির একটা দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলেন' যে, তারা ভয়াল পার্বত্য-পথে নিশ্চিন্তে পদক্ষেপ করলেও সমতল প্রদেশে অপটুর ন্যায় আচরণ করত ও অনভ্যাসের দরুণ হোঁচট খেত। ভুটানের ঘোড়া সম্বন্ধে পেম্বারটনের মন্তব্য নিম্নরূপ :

"The poney of Bhutan, in every part of his country, has to overcome these difficulties of ascent and descent, whenever he moves from his stall, and one of those adaptations of nature to peculiar circumstances, which in the brute creation so constantly appear, has given a power and muscular development to the shoulder and the neck of the Bhutan poney, which peculiarly qualify him for overcoming the most rugged and precipitous ascents ; but other parts of the frame are not proportionately great. The same animal which amongst his native mountains, will climb the most rugged and precipitous path, with an overhanging mountain on one side, and a steep abyss a few inches distant on the other; without

making a false step, or evincing any symptom of apprehension ; if taken into the plains, will stumble at every step, and shy at every pebble to the imminent danger of his rider .. ....from physical structure of the country, there are but few spots in the whole of Bhutan, where they could be brought with effect to act as cavalry ; and they are evidently retained more, for purposes of state and traffic, than as an arm of their military strength, on which any reliance is placed." (*Report on Bootan*, Calcutta 1839, pp. 133-34 দ্রষ্টব্য)।

একজন অভিজ্ঞ সৈনিক হিসাবে পেম্বারটনের এই বর্ণনা প্রকৃতই মূল্যবান। মুঙ্গের অনুশাসনের বর্ণনা পড়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় সে সম্রাট দেবপাল কোন পার্বত্য প্রদেশ আক্রমণকালে দূরদর্শিতাবলে সেই দেশেরই অশ্ব নিয়োজিত করেছিলেন। এই শ্রেণীর পার্বত্য ঘোটক স্বভাবতঃই সমতল প্রদেশ থেকে গিরিগাত্রে আরোহণ করে অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হবে। নানা কারণে দেবপালদেবের কম্বোজ-আক্রমণ যেন ভুটান-পথ ও তার সন্নিহিত পর্বতমালার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও যে হিমালয় ও তিব্বতে ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়োজিত হ'য়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় তবকাত্-ই-নাসিরীতে বর্ণিত বক্তিয়ার খিলজির অভিযান-কাহিনীতে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দ্বিজ মাধবানন্দ রচিত চণ্ডী-কাব্যে "কমেদা বাজী" নামটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্তের ধারণায় এই নামটি কম্বোজদেশীয় অশ্বের পরিচায়ক। কালকেতুর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসরমান কলিঙ্গ-রাজের সওয়ার-বাহিনীর বর্ণনায় উল্লিখিত আছে,

"ইরাণী টাঙ্গন তাজী   তুরঙ্গ কমেদা বাজী
সিন্ধুদেশী তুরগ বিশাল।
কুঁদিতে কুঁদিতে যায়   আকাশ ছুঁইতে চায়
ধরিয়া রাখয়ে বাজিপাল ॥"

(ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন: 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬)। পশ্চিম দিনাজপুরে প্রবাহিত টাঙ্গন নদীর স্রোতধারাকেও যে একদা দ্রুতগামী অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ব্যাখ্যায় টাঙ্গন (সং টঙ্কন) অশ্বকে "দৃঢ় বলিষ্ঠ পার্বত্য ঘোড়া" হিসাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে ("কবিকঙ্কন চণ্ডী", দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬৬০)।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণায় কম্বোজ জাতি প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং পদ্মপুরাণে তারা "ম্লেচ্ছ" রূপে বর্ণিত হ'য়েছে। তাঁর মতে "কম্বোজ" ও "মেচ" জাতি অভিন্ন। তিনি দেখিয়েছেন, পদ্মপুরাণের বর্ণনানুসারে এই কুবাচ (=কোচ=কমোচ=কম্বোজ) গণের মূল নিবাস ছিল পার্বত্য অঞ্চলে ("কূট যোনয়ঃ")। এছাড়া, বিভিন্ন পণ্ডিতগণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হ'য়েছেন যে, খৃষ্টীয় ৯৬৬ সালে উৎকীর্ণ বাণগড় লিপির কম্বোজগণও ("কম্বোজান্বয় গৌড়পতি") প্রকৃতপক্ষে কোচজাতীয়। বাণগড় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, এই যুগে উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র করে পাল ও কম্বোজদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি মূল কারণ অবশ্য "কম্বোজান্বয় গৌড়পতি" কথাটি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহম্মদ-ইবন্-বক্তিয়ার কর্তৃক পরিচালিত তিব্বত-অভিযানকে ঐতিহাসিক ক্রিয়াচক্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এখানে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, যে, তাঁর সেনাবাহিনী যাত্রা করেছিল বাণগড় অথবা দেবীকোট থেকে। নিঃসংশয়ে, বাঙলার মুসলমান দিগ্বিজয়ীদের সঙ্গে উত্তরের ইন্দো-মোঙ্গলীয় জাতিসমূহের সংঘর্ষ গুপ্ত-পাল সাম্রাজ্যেরই এক অনিবার্য উত্তরাধিকার। এ বিষয়ে গুপ্ত ও পাল সম্রাটগণ একদা যে বিক্রম ও সামরিক সংগঠনশক্তি দেখিয়েছিলেন তুর্কি ও মুঘলগণ সেখানে বারংবার ব্যর্থ হ'য়েছিলেন। নেপাল, ভুটান, কামতা-সাম্রাজ্য ও কামরূপকে তাঁরা কখনও সাফল্যের সঙ্গে পর্যুদস্ত করতে পারেননি।

মুহম্মদ-ইবন্-বক্তিয়ার কর্তৃক পরিচালিত তিব্বত অভিযানের

পর ভুটান-সীমান্তে নিম্ন-হিমালয় থেকে প্রসারিত প্রাচীন অরণ্যকে পুনরায় ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় ভেনেসীয় পর্য্যটক মার্কো পোলোর বৃত্তান্তে যেখানে চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হ'য়েছে চীনদেশের সম্রাট "গ্রাণ্ড-খান" (কুব্লাই খাঁ) কর্তৃক প্রেরিত রণ-দুর্মদ সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে 'মিয়েন' (Mien) ও 'বাঙ্গালা'র নৃপতির এক রক্তাক্ত যুদ্ধ। এল, এফ, বেনেডেটো ও আল্ডো রিচি অনুদিত মার্কো পোলোর এই বর্ণনাটির ভাবানুসরণ তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিতে কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে দেওয়া হ'ল।

"আপনাদের নিশ্চয়ই জানা উচিত ভোচান-রাজ্যে সংঘটিত একটি গৌরবময় যুদ্ধের কাহিনী। আমি এই কাহিনীটি বিবৃত করতে বিস্মৃত হ'লেও এই ঘটনাটি উল্লেখের উপযুক্ত। এখন আমরা এই যুদ্ধের কার্য্য-কারণাদির খুঁটিনাটি-সমূহ বর্ণনা করব।

আপনাদের জ্ঞানার্থে নিবেদন, যে, খৃষ্ট-জন্মের পর ১২৭২ সালে মহামহিম খান (Great Khan) এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন ভোচান ও কারাজান রাজ্যদ্বয়কে অপরাপর অধিবাসীদের দ্বারা সম্ভাব্য আক্রমণ ও লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। কারণ, মহামহিম খান এখনও সেই দেশ দুটিতে তাঁর কোন পুত্রকে প্রেরণ করেননি যা' তাঁকে পরবর্তীকালে করতে হ'য়েছিল যখন তিনি তাঁর এক পরলোকগত পুত্রের সন্তান এসেন্তেমুরকে রাজা ঘোষণা করেন। এই সময়ে মিয়েন এবং বাঙ্গালায় শাসন করতেন এক অতি পরাক্রান্ত নৃপতি। এই রাজার শাসনাধীনে ছিল এক জনবহুল বিশাল রাজ্য এবং তিনি ছিলেন সুবিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি মহামহিম খানের অধীনস্থ হননি যদিও অচিরেই তিনি তাঁর দ্বারা পরাজিত হন এবং ফলস্বরূপ উল্লিখিত দুইটি রাজ্যই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। যাই হোক, ঘটনাটি এইরকম। মিয়েন ও বাঙ্গালার রাজা যখনই শুনতে পেলেন যে মহামহিম খানের সেনাবাহিনী ভোচানে উপস্থিত হ'য়েছে তখন তিনি সবিশেষে অনুভব করলেন, যে, এই সেনাবাহিনীকে এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা প্রয়োজন যা'তে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস

করা যায়। এই অবসাধনে কৃতকার্য্য হ'লে মহামহিম খানের মনে এই প্রদেশে পুনর্বার সৈন্যদল প্রেরণের চিন্তা যে তিরোহিত হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই পরিকল্পনায় রাজা আরম্ভ করেন তাঁর এমন বিপুল উদ্যোগ ও আয়োজন যা'র বর্ণনা আমি বিবৃত ক'রব। আপনারা অবশ্যই জানবেন যে সত্য সত্যই তিনি দু'হাজার বিশাল-দেহ হস্তী সংগ্রহ করেন। প্রতিটি হাতীর পিঠে নির্মান করানো হয় সুদৃঢ় কাঠের বুরুজ। এগুলি গঠিত হয় সুনিপুণভাবে যুদ্ধের নিমিত্ত। প্রতিটি বুরুজে অন্যূন দ্বাদশজন যোদ্ধার স্থান হ'ত। এমনও কোন কোনটি ছিল যেখানে ষোলজন কিম্বা তার অধিক সংখ্যক সৈনিকেরও স্থান হ'তে পারত। এছাড়া, তিনি যুদ্ধার্থে সমবেত করেন প্রায় ৪০,০০০ সৈনিক যাদের মধ্যে ছিল সওয়ার বাহিনী এবং সামান্য-সংখ্যক পদাতিক। তাঁর মত একজন মহাপরাক্রান্ত রাজার পক্ষে যতদূর সম্ভব আয়োজন করা সম্ভব তাই সম্পাদিত হ'য়েছিল। কারণ, প্রকৃতই তাঁর সেনাবাহিনীর পক্ষে কোন বিশাল কর্মসূচী সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল। এর বেশী আর কী বলতে পারি? তিনি যখন তাঁর উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন তখন আর অধিক কাল-ক্ষয় না ক'রে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সোজাসুজি যাত্রা করলেন ভোচানে অবস্থানকারী মহামহিম খানের সেনাবাহিনীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে। এইভাবে তাঁরা অগ্রসর হ'তে লাগলেন নির্বিবাদে কোন উল্লেখনীয় বাধার সম্মুখীন না হ'য়ে। অবশেষে, তাতার সৈন্যবাহিনী থেকে তাঁদের দূরত্ব সঙ্কীর্ণতর হ'ল মাত্র তিন দিনের পথে। এইখানে রাজা শিবির স্থাপন করলেন তাঁর সেনাবাহিনীকে বিশ্রামদানের উদ্দেশ্যে।

তাতার সেনাবাহিনীর নেতা যখন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে অবগত হ'লেন, যে, এই নৃপতি তাঁর বিরুদ্ধে এত বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসরমান তখন তিনি বিপন্নবোধ করলেন কারণ তাঁর অধীনে ছিল মাত্র ১২,০০০ অশ্বারোহী। তিনি ছিলেন অবশ্যই একজন নির্ভীক ও সুযোগ্য নেতা। তাঁর নাম ছিল নেসূক্রাদ্দিন্। স্বভাবতঃই তিনি সেনাবাহিনীকে সবিশেষে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন এবং এই দেশ

ও তার অধিবাসীদের রক্ষার নিমিত্ত সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু, এই দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করবার কী প্রয়োজন? আপনারা অবগত হ'ন, যে, তাতারগণ সর্বসমেত, ১২,০০০ অশ্বারোহী নিয়ে উপস্থিত হয় ভোচানের প্রান্তরে এবং অপেক্ষা করতে থাকে শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায়। এই নীতি অবলম্বন করে তারা প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। এছাড়া, প্রমাণিত হয় সুনেতৃত্ব। কারণ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, যে, এই প্রান্তরের ধারেই বিস্তৃত আছে তরুময় এক বিশাল ও গভীর বনানী।

এই ভাবেই, যেমন শ্রুত হ'লেন, তাতারবাহিনী শত্রুর অপেক্ষায় সমতল প্রান্তরে অপেক্ষমান রইল। কিন্তু, আমরা তাদের প্রসঙ্গ ক্ষণিকের নিমিত্ত স্থগিত রেখে সময়ান্তরে আলোচনা করব; অবশ্য তা' আমরা এখনই পুনর্বার বিবৃত করব। আপাততঃ, তাদের শত্রুদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

এখন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে মিয়েন-অধিরাজ ও তাঁর সেনা-বাহিনী সামান্যকাল বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে শিবির উঠিয়ে পুনর্বার যাত্রা করলেন। এইভাবে তাঁরা অগ্রসর হ'তে লাগলেন যতক্ষণ না তাঁরা উপস্থিত হ'লেন ভোচানের সমতল প্রান্তরে, যেখানে ইতিমধ্যেই তাতারগণ প্রস্তুত ছিল। যখন তাঁরা এই প্রান্তরে উপস্থিত হ'লেন, বৈরী-বাহিনী থেকে মোটামুটি এক মাইল দূরে রাজা তাঁর সশস্ত্র যোদ্ধপূর্ণ সদুর্গ রণহস্তীগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করলেন। তারপর তিনি এক বিজ্ঞ নৃপতির মতই ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে ও সাবধানে সাজিয়ে নিলেন। যখন তিনি এইভাবে সবকিছু সুবিন্যস্তভাবে প্রস্তুতির পর্য্যায়ে উপস্থিত করলেন তখনই তিনি তাঁর সমগ্র সেনা-বাহিনী নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'লেন।

যখন তাতারগণ তাদের অগ্রসর হ'তে দেখল তাদের মধ্যে তখন হতাশার চিহ্নমাত্রও দেখা গেলনা। পক্ষান্তরে বরং তাদের মধ্যে সাহস ও শক্তিমত্তার ভাব প্রকাশিত হ'য়েছিল। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, আপনারা নিশ্চিতভাবে অবগত হবেন, যে, তারা সকলেই সুশিক্ষিত-

ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে লাগল যথাযোগ্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে। তারা যখন শত্রুর নিকটবর্তী হ'ল এবং যখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না তখন (আক্রমণকারী) হস্তীগুলিকে দেখে তাদের অশ্বগুলি এতই ভীত হ'য়ে পড়ে, যে, তাদের আরোহীদের পক্ষে বৈরীব্যূহের দিকে এগিয়ে আসা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পালাতে সুরু করে। অপরপক্ষে, রাজা ও তাঁর সৈন্যদল হস্তীবাহিনী নিয়ে সমানে অগ্রসর হ'তে থাকে। এই দৃশ্য অবলোকন করে তাতারবাহিনী হ'য়ে গেল অত্যন্ত দিশেহারা এবং অপারগ হ'ল তাদের কর্তব্য স্থির করতে। কারণ, তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করল, যে, তাদের যুদ্ধাশ্বসমূহকে যদি অগ্রসর করতে না পারা যায় তাহ'লে তাদের সবকিছু হারাতে হবে। যাইহোক, তারা তাদের এই বিপত্তিকে অতিক্রম ক'রতে সমর্থ হ'ল সুচতুর রণকৌশল অবলম্বন করে। তাদের দ্বারা অবলম্বিত এই রণনীতির কথাই এখন আমি বলে যাব। আপনারা অবশ্যই জানবেন, যে, যখন তাতারদল দেখতে পেল, যে, তাদের ঘোড়াগুলি অত্যন্ত ভীত হ'য়ে পড়েছে তখন তারা সকলে এগুলির পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং তাদের অরণ্যের গভীরে নিয়ে যেয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

তারপর তারা ধনুক নিয়ে হাতীগুলিকে লক্ষ্য করে শরবৃষ্টি করতে লাগল। তারা এত বেশী সংখ্যক তীর ছুঁড়তে লাগল যে তা' সত্যিই আশ্চর্য্যজনক। রাজকীয় সেনাবৃন্দও অবশ্য তাতারদের উপর ঘন ঘন তীরবর্ষণ করতে লাগল এবং তাদের আক্রমণ ভীষণ হ'য়ে উঠল। কিন্তু তাতারগণ যোদ্ধা হিসাবে রাজকীয় সেনাদের চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ছিল। তারা মহা-পরাক্রমের সঙ্গে আত্মরক্ষা ক'রে চলল। আপনাদের আর অধিক কী বলব? আপনারা জানুন, যখন বেশীর ভাগ হাতীই বর্ণনানুযায়ী এইভাবে শরাঘাতে জর্জরিত হ'ল তখন তারা ঘুরে পালাতে সুরু করল রাজকীয় সেনাবাহিনীর দিকেই। তাদের এই ভীষণতা দেখে মনে হ'য়েছিল সমগ্র পৃথিবীই যেন ভেঙ্গে পড়ছে। তারা একমাত্র

সেখানেই থামল যেখানে অরণ্য সুরু হ'য়েছে। তারপর তারা পিঠের বুরুজগুলিকে ভেঙ্গে এবং সবকিছুকে চূর্ণ ও ধ্বংস করে পথ করে নিল। তারা বনভূমির এখানে সেখানে ছুটাছুটি করতে লাগল ভীতি-সঞ্জাত ক্রোধে দুর্দমনীয় হ'য়ে। তাতারদল যখন দেখতে পেল যে হাতীগুলি এইভাবে পলায়নপর হ'য়েছে তখন তারা আর এক মুহূর্তও কাল-বিলম্ব না ক'রে ত্বরিতে অশ্বারোহণ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজা ও তাঁর যুযুধান সেনাবাহিনীর উপর। এইবার রাজ-সৈন্য আরম্ভ করল প্রবল শর-বর্ষণ এবং সুরু হ'ল এক অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণ সংগ্রাম। রাজা ও তাঁর সৈন্যদল আত্মরক্ষা করে চলল অতি সাহসের সঙ্গে। ফলে যখন তারা তাদের তীরগুলি নিঃশেষ করে ফেলল তখন তারা হাতে নিল তরবারি কিম্বা মুদ্গর। দুইপক্ষ ভীষণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপর এবং চলল ভীষণতম আঘাতের বিনিময়। এই সময়ে একজন দর্শক দেখতে পেতেন যোদ্ধৃবৃন্দ খড়গ ও তোমর অথবা মুদ্গরের দ্বারা প্রবল আঘাত হানছে অথবা অনুরূপ আঘাত গ্রহণ করছে। এইমাত্র দেখা যাবে অশ্বারোহীবৃন্দ তাদের অশ্বগুলির সঙ্গে বিখণ্ডিত হ'য়েছে, আবার পরক্ষণেই দেখা যাবে তাদের হাত, পা, দেহ ও মুণ্ড বিচ্যুত হ'য়েছে। কারণ, আপনারা নিশ্চিতভাবে অবগত হবেন, বহু সৈনিক ভূলুণ্ঠিত হ'ল নিহত অথবা মরণ-আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে। কোলাহল ও উচ্চধ্বনি এতই মুখরিত হ'ল, যে, তখন কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের বজ্র-নির্ঘোষও শ্রবণ করা সম্ভব ছিল না। এই ভীষণ ও ভয়াল যুদ্ধ সংঘটিত হ'য়ে চলল চারধারে। কিন্তু, আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন, এই সংগ্রামে নিঃসন্দেহে তাতারগণের বেশী সুবিধা হ'য়েছিল। সত্যিই যেন এক ভাগ্যহীন প্রহরে রাজা ও তাঁর যোদ্ধৃবৃন্দ যুদ্ধ সুরু করেছিলেন। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে কতজনই না সেদিন নিহত হ'য়েছিল। যখন এই সংঘর্ষ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্থায়ী হ'য়েছিল তখন রাজা ও তাঁর সেনাদলের কি দুর্দশাই না হয়! সেনাদলের মধ্যে নিহতের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে তারা আর লড়াই চালিয়ে

যেতে সক্ষম হ'ল না। কারণ, তারা পরিষ্কার দেখতে পেল, যে, এই যুদ্ধ চালাতে চেষ্টিত হ'লে তাদের সকলেরই প্রাণনাশ হবে। সুতরাং, তারা আর যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পালাতে লাগল। তাতার সেনা যখন দেখতে পেল শত্রুরা পলায়নপর তখন তারা তাদের ধ্বংস-সাধনে রত হ'ল। এছাড়া, তারা পলায়নরত যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল নির্দয় হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে করতে। এই দৃশ্য তখন প্রকৃতই মর্মান্তিক হ'য়ে উঠেছিল। কিছুকাল পর তারা পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত হ'ল এবং অরণ্যে প্রবেশ করল কিছু-সংখ্যক হস্তীকে স্ববশে আনবার নিমিত্ত। তারা সুবৃহৎ বৃক্ষগুলিকে কেটে তাদের সামনে ফেলে রাখল যা'তে তাদের গতিরুদ্ধ হয়। কিন্তু, এই উপায়েও তাদের ধরা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু, তাদের বন্দীকৃত রাজ-সৈন্যরা তাদের বশীভূত করতে সফল হ'ল। এর কারণ, হাতীরা অন্যান্য জীবের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান। এইভাবেই তারা দুই শতেরও অধিক করিযূথকে ধরতে সক্ষমহ'ল। এই যুদ্ধটির পরেই মহামহিম খান বহু-সংখ্যক হাতীর ব্যবহার সুরু করেন।

এইভাবে তা'হলে যুদ্ধ সুরু হ'ল এবং অবশেষে জয়ী হ'ল তাতারবৃন্দ। এই জয়ের কারণ, মিয়েন ও বাঙ্গালার রাজ-সৈন্যরা তাতারদের মত অস্ত্র-সজ্জিত ছিল না। এছাড়া প্রথম সারির রণ-হস্তীগুলি এমন কোন বর্মের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না যাতে তারা যুদ্ধের প্রারম্ভে নিক্ষিপ্ত তীরের ঝাঁকগুলি সহ্য করতে সক্ষম হ'য়ে শত্রু-ব্যূহের উপর আঘাত হেনে তাকে বিশৃঙ্খল করে দিতে পারে। কিন্তু, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, যে, রাজার পক্ষে অরণ্য-সীমাকে পশ্চাতে রেখে অপেক্ষমান তাতার-সৈন্যদের প্রথমে আক্রমণ করা কখনও উচিত হয়নি। বরং তাঁর উচিত ছিল মুক্ত প্রান্তরে শত্রুর অপেক্ষায় থাকা। এখানে হয়ত তাতারগণ সহ্য করতে অক্ষম হ'ত তাঁর রণ-হস্তীগুলির প্রথম আক্রমণ এবং এই সময়ে ঘোড়সওয়ারদের দুইটি 'ডানা' ও পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে রাজা তাদের ঘিরে ধ্বংস করতে সক্ষম হ'তেন।"

মার্কোপোলোর এই বিবৃতি পাঠ করে স্বভাবতঃই উপলব্ধি করা যায় এই যুদ্ধের গুরুত্ব। তাঁরই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার কাল "গ্র্যাণ্ড খান" (অথবা "গ্র্যাণ্ড কান") এর জীবদ্দশায় এবং অবশ্যই খৃষ্টীয় ১২৯০ সালের কিছু পরে। এক জায়গায় তিনি এই সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন যা' নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"Bangala is a province lying towards the south, which, in the year 1290 after Christ's Nativity, when I, Marco, was at the Great Kaan's court, had not yet been conquered, but the Kaan's armies and men were already there to conquer it. You must know that this province has a king and a language of its own. They are most wretched Idolaters. They are on the borders of India."

মার্কোপোলো কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তান্ত পাঠে অনুমান করা যায় যে এই মর্যাদাপূর্ণ ও রক্তাক্ত যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল ভুটানের অদূরেই কোন প্রাচীন অরণ্যের মধ্যে। 'ভোচাং' ও ভুটান যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। এই প্রসঙ্গে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায়, যথা,

(ক) বঙ্গ (বাঙ্গালা) ও মিয়েনের রাজা কে ?

(খ) 'মিয়েন' কোন্ দেশ ?

(গ) যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল কোন্ অঞ্চলে ?

এই তিনটি প্রশ্নই অবশ্য অত্যন্ত জটিল কারণ, ইতিপূর্বে পণ্ডিত-সমাজে এই প্রসঙ্গে সামগ্রিকভাবে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড়ে যেমন মুসলমানগণ রাজত্ব করেন উত্তরবঙ্গের এক বৃহৎ অংশে তেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল কামতা-রাজ্য যা'র সঙ্গে কামরূপের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব সর্বজনবিদিত। যোগিনীতন্ত্রের বর্ণনানুযায়ী খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপ

যবনদের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছিল। ঐতিহাসিক খান চৌধুরী আমানতুল্লা আহ্‌মেদ এ বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যোগিনীতন্ত্রের একস্থানে বিবৃত হ'য়েছে,

"হে মহেশ্বরী, কুমারী চন্দ্রকালেন্দু শাক (১৩১৮ শক, ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ) গত হইলে কামরূপে পুনরায় যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। যবনরাজ কুবাচরাজের সহিত মিলিত হইয়া বারো বৎসর কাল কামরূপে রাজত্ব করিবেন।" ইত্যাদি। এই উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায়, যে, কোন এক সময়ে গৌড়ের মুসলমান শাসকগণ ও কোচ নৃপতিগণ সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা আক্রমণে লিপ্ত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, বক্তিয়ার কর্তৃক পরিচালিত তিব্বত-অভিযানকালে কামরূপ-রাজ প্রথম দিকে আক্রমণকারীর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখ্‌তিয়ারউদ্দিন তুগ্রিল খাঁ মালেক ইউজ্‌বক এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে সোলতান মগিসউদ্দিন তুগ্রিল ক্ষণস্থায়ীভাবে কামরূপ জয় করেন। এই দুইজনের মধ্যে এখ্‌তিয়ারউদ্দিন তুগ্রিল খাঁ মালেকই কিছুকালের জন্য প্রকৃত সাফল্য অর্জন করেন যদিও বর্ষাসমাগমে তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি নিজে নিহত হন। মার্কোপোলোবর্ণিত বঙ্গীয় রাজার নাম না জানা গেলেও এ বিষয়ে অনুমান করা যায় যে তিনি গৌড়ের কোন এক অধিপতিও হ'তে পারেন। অবশ্য, এমনও সম্ভব, এই অজ্ঞাত রাজা ছিলেন কাম্‌তা-অঞ্চলের কোন কোচবংশীয় অধীশ্বর। ভুটানরাজ্যের উল্লেখ মেনে নিলে ধারণা হবে রণস্থল হয়ত বা অবস্থিত ছিল হাসিমারা-চিলাপাতা অঞ্চলের কোন বনভূমিতে। মিয়েনরাজ্য ও ব্রহ্মদেশ অভিন্ন হ'লেও অনুমান করা যায়, যে, এই দেশ ছিল তিব্বতী-ব্রহ্মীয় (Tibeto-Burman) জাতি সমূহের দ্বারা অধ্যুষিত কামতা ও কামরূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুব্লাই খান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রমণের সঙ্গেই সম্ভবতঃ বিজড়িত ছিল এই অভিযান। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ পর্য্যটক রালফ্‌ ফিচ্‌ বর্ণনা করেছেন যে তদানীন্তন কোচ সাম্রাজ্য প্রায় কোচীন চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁর

যাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) জীবদ্দশায় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন,
"I went from Bengala into the country of Couche, which lieth 25 days' journey northwards from Tanda. The king is gentile, his name is Suckel Counse; his country is great, and lieth not far from Couchin China (*sic* !) for they say they have pepper from thence."

(Ralph Fitch, pp. 111-112)।

রালফ্ ফিচের এই বর্ণনায় যদি কোন অতিশয়োক্তি থাকে তা'হলেও অস্বীকার করা যায় না যে, অতীতে কোন কোন সময়ে কামতা-সাম্রাজ্য ব্রহ্মদেশীয় সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে তিব্বতীয় ভাষায় তিব্বতের এক প্রাচীন নাম "সালাই মিয়েন-জোং" অর্থাৎ "স্বর্ণময় ভৈষজ্য উপত্যকা" * স্বভাবতঃই, ভৈষজ্য সাধনার জন্যই তিব্বতের এই প্রাচীন নাম। তবে কি অনুমান করতে হবে, অতীতে কোন তিব্বতী ও বঙ্গীয় বাহিনী একসঙ্গে কুব্লাই খানের মোঙ্গল বাহিনীকে বাধা দিয়েছিল? যদি প্রকৃতই কুব্লাইখানের সেনাবাহিনী পার্বত্য ও সমতল-রাজ্যের অধিপতি কোন বঙ্গেশ্বরকে পরাভূত করে থাকে তা'হলে মধ্যযুগে কোচ নৃপতি বিশ্বসিংহ কর্তৃক ভুটান আক্রমণের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভূত হবে। এই ধরণের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হয়ত বা সামান্ত-রক্ষার সহায়ক বলে বিবেচিত হ'য়েছিল। অপরপক্ষে, যদি এই সংঘর্ষ পরাজিত ক'রে থাকে গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তাকে, তাহ'লেও উপলব্ধি করা যাবে মুহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের তথাকথিত চীন-আক্রমণকে। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য জানা যায়, এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল হিমালয়ে অবস্থিত কূর্মাচল অথবা কারাজল্ জয়। কুব্লাইখানের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও চীন-সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তৃতির

---

* এই তথ্যটির জন্য লেখক ঋণী কালিম্পংএ অবস্থিত "জাং-দোগ-পাল্রি-কো-ত্রাং ইন্স্টিটিউট্ অব টিবেটোলজি"র ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শ্রী টি, এন্, শেরপার নিকট।

পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রাচীন বিবরণের মূল্যায়ন অনিবার্য। মার্কোপোলোর বর্ণনায় যদিও কোন দুর্গের উল্লেখ নেই ভুটানের সীমান্ত পারে অবস্থিত যুদ্ধস্থলের সু-উচ্চ ও প্রবীন বিটপী-শ্রেণীর বর্ণনা চিলাপাতা বনভূমি ও তার সন্নিহিত অরণ্যশ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া, এই রণস্থলটি কোন দুর্গ অথবা নগরীর অদূরে নির্বাচন করাই ইতিহাসের এক পরিচিত রীতি। অতীতে উত্তর-বঙ্গে একাধিক দুর্গ ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কোচবিহারে অবস্থিত গোসানীমারির দুর্গ, ডোমারের নিকটবর্তী ধর্মপালরাজার গড়, চিলাপাতা অরণ্যে আবিষ্কৃত নলরাজার গড় এবং জলপাইগুড়ির দক্ষিণে অবস্থিত ভিতরগড়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে অবস্থিত বিশ্বসিংহ কিল্লা, বিক্রমরাজার গড, বৈদ্যের গড়, রওনাগড়, প্রতাপগড় ইত্যাদি পুরাতন স্থানগুলি। উত্তর বাঙলায় অবস্থিত ধর্মপালরাজার গড় ও ভিতরগড বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত। মধ্যযুগে জলপাইগুডি জেলায় যে এক দুর্গ-শ্রেণী ছিল তা'র সাক্ষ্য দেয় স্থানীয় 'রায়কত' উপাধি। দুর্গাধিপতি অর্থে ব্যবহৃত 'রায়কোট্ট' নাম থেকেই যে এই পদবীর সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই যে ভুটান-পথে বাঙলার সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হ'ত তার অন্যতম সাক্ষ্য জিয়াউদ্দিনের বর্ণনা বক্তিয়ার খিল্‌জির আক্রমণ-প্রসঙ্গে পূর্বেই বিবৃত হ'য়েছে। হাক্লাইট্‌ কর্তৃক সংকলিত সমুদ্র-যাত্রার বিবরণীসমুহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রালফ্‌ ফিচ্‌ এর বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

"There is a country four days journey from Cuch or Quichue, before mentioned, which is called Bootanter, and the city Bottea, the king is called Durmain, the people where of are very tall and strong; and there are merchants which came out of China, and they out of Muscovia or Tartary; and they came to buy (sell?) musk, cambals, agates, silk, pepper, and suffron of Persia. The country is very great;

three months journey. There are very high mountains in this country, and one of them so steep, that when six days journey off it, he may see it perfectly. Upon these mountains are people which have ears of a span long, if their ears be not long, they call them apes. They say that when they be upon mountains, they see ships in the sea, sailing to and fro; but they know not from whence they come nor whither they go. There are merchants which come out of the east; they say, from under the sun, which is from China, which have no beards; and they say, there it something warm. But those which come from the other side of the mountains, which is from the north, say, there it is very cold. The northern merchants are apparalled with woollen cloth and hats, white hozen close, and boots which be of Muscovia or Tartary. They report that in their country they have very good horses, but they be little; some men have four, five or six hundred horses and kine, they live with milk and flesh. They cut the tails of their kine and sell them very dear; for they be in great request, and much esteemed in those parts; the hair of them is a yard long They use to hung them for bravery upon the heads of their elephants: they be much used in Pegu and China, they buy and sell by scores upon the ground." (*Hukluyt's Voyages*, vol. II, p. 257. Capt. R. Boileau Pemberton: *Report on Bootan*, Calcutta 1839, pp. 147-48)

এই বর্ণনাটি পাঠ করে ক্যাপ্টেন পেম্বারটন অনুভব করেছিলেন যে তাঁর সময়েও বাঙলা, ভুটান ও তিব্বতের মধ্যে একই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ভোট কম্বলের নজির প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও পাওয়া যায়, যথা—

"ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার।"

—চৈতন্যচরিতামৃত

"গৌরাঙ্গসুন্দর পড়ে নিরন্তর
ভোটকম্বলে বসিঞা।"

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

(চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: "কবিকঙ্কণ চণ্ডী."
দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬৫৯)।

ভুটানী কম্বল ও ভুটান ও তিব্বতে ব্যবহৃত রত্নপ্রস্তর এ্যাগেট ও ফিরোজা, এবং পার্বত্য উচ্চভূমি থেকে দৃষ্টিগম্য ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান পালতোলা দীর্ঘ নৌকাগুলি সবই যেন বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। স্বভাবতঃই ব্রহ্মপুত্রে চালিত সুবৃহৎ নৌকাগুলিকে একদা দূর থেকে সমুদ্রগামী অর্ণবপোতের মতই প্রতীয়মান হ'ত। পেম্বারটনের সময়ে একই বাণিজ্য-দ্রব্যসমূহের ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্র ছিল রঙপুর। এই বাণিজ্যের তালিকায় ছিল উলের পোষাক, টুপী, বুটজুতা, ক্ষুদ্রকায় অশ্ব এবং চামরী গাভীর পুচ্ছ। একদিকে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য এবং অপরদিকে চীন, তিব্বত ও ভুটানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ উপস্থিত হওয়ার জন্য এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই যুগব্যাপী বাণিজ্যধারা ক্রমেই ম্রিয়মান হ'য়ে আসে।

অতীতে ভুটানের পথে চীন-ভারত সম্পর্ক যে মধ্যে মধ্যে বিরোধিতায় পর্য্যবসিত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিকবার। কুব্লাই খানের সেনাপতি কর্তৃক বঙ্গ-আক্রমণের পাঁচশত বৎসর পরে ১৮১৫ সালে নেপালাধীশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বিরুদ্ধে শক্তি-সঞ্চয় করতে প্রয়াসী হন এবং চীন-সম্রাটকে ভুটানের গিরি-পথে বঙ্গ-আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। তাঁর সামরিক প্রকল্পের পশ্চাতে ধারণা এই ছিল,

যে, চীনদেশীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে কলিকাতা থেকে ইয়োরোপীয়দের বিতাড়িত করা সহজ কারণ, নব-অধিকৃত জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষ) রাজন্য ও অধিবাসীদের নিকট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ছিল আন্তরিকভাবে প্রত্যাশার বস্তু। ক্যাপ্টেন পেম্বারটন কর্তৃক উদ্ধৃত নেপালাধীশের এই পত্রটির অংশবিশেষের মর্মানুবাদ নিম্নরূপ :

"ধার্মা(ধর্মরাজ শাসিত ভুটান)র আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। আপনি অনায়াসে দুই-তিন লক্ষ সৈন্য ভুটানের পথে বঙ্গ-জয়ের জন্য পাঠাইতে পারেন। তাহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়দের ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। শত্রুরা সমস্ত রাজাদের পরাভূত করিয়া অন্যায়-পূর্বক দিল্লীশ্বরের সিংহাসন দখল করিয়াছে। স্বভাবতঃই আশা করা যায়, ইহারা সম্মিলিত হইয়া হিন্দুস্তান হইতে ইয়োরোপীয়দের বিতাড়নে সচেষ্ট হইবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে আপনার নাম সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হইবে এবং সেখানকার সমগ্র অধিবাসী আপনাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। আপনি যদিও মনে করেন নেপাল বিজিত হইলে এবং গুর্খাগণ চীন-সম্রাটের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মহামান্য আপনার বাস্তব স্বার্থের ক্ষতিসাধন হইবে না, আপনাকে সনির্ব্বন্ধভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে আপনার সাহায্য ভিন্ন আমি ইংরাজদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম নহি। তাঁহারা নেপাল জয় করিতে পারিলে লাসা অধিকারের নিমিত্ত বদ্রিনাথ, মানস সরোবর ও দীঘরচীর দিকে অগ্রসর হইবে। আমি এই জন্য প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি ইংরাজদের পত্রদ্বারা আদেশ দিবেন যাহাতে তাঁহারা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা করদ-রাজ্য গুর্খাদেশ হইতে তাঁহাদের সেনাবাহিনীগুলিকে অপসারণ করে। অন্যথায় আপনি সাহায্যার্থ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিবেন। আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনি এ বিষয়ে সামরিক অথবা আর্থিক বিনিয়োগে কালক্ষেপন করিবেন না যাহাতে আমি বৈরীদের বিতাড়িত করিতে পারি এবং পর্বতসমূহকে স্বাধিকারে রাখিতে সক্ষম হই। অন্যথায় কতিপয় বৎসরেই ইংরাজ লাসার অধীশ্বর হইবে।"

(Pemberton, *Ibid*, pp. 165-66; Fraser, *Tour in Himala Mountains*, Appendix & p 527)

সে যুগে নেপালাধীশ কর্তৃক লিখিত পত্রের কূটনৈতিক ব্যাখ্যা যেরকমই হোক্ না কেন এই সব ইতিহাসে উপলব্ধি করা যায় ভুটান-সীমান্তে প্রসারিত উত্তর বঙ্গের সবিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-সমূহের এই পটভূমিকায়ই দাঁড়িয়ে আছে নলরাজার গড়ের অতীত ধ্বংসাবশেষ। মধ্যযুগে এবং সিপাহী-যুদ্ধের পূর্বকালে উত্তর বাঙলায় প্রসারিত তরাই অথবা দুয়ার-অঞ্চলের শাসন নিয়ে কোচ বিহার ও ভুটানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ উপস্থিত হ'লেও এই সব ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বদাই সাক্ষ্য দেয় ভারতীয় রাজশক্তির সংগঠন-প্রতিভা ও সীমান্ত নীতির। মুসলমান রাজশক্তির পতনের পর অরণ্যাবৃত সমতলভূমি ভুটানের করতলগত হ'লেও কোচ নৃপতিগণ পুনরায় কোন কোন পরগণা অথবা জেলা স্বাধিকারে আনতে সক্ষম হন। ক্যাপ্টেন পেম্বারটন তাঁর *Report on Bootan* নামক গ্রন্থের *Of the Bootan Dooars on the Bengal Frontier* শীর্ষক অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখেছেন "Of the six Dooars extending from Dalimcotta east to Buxa, very little information is procurable beyond the fact, that the lands in the plains, which touch upon the confines of Bengal and Bootan, belonged, originally, to the former, but had been wrested from it, during the decline of the Mohomedan power in these Provinces. Subsequently to that period, several of the most important of these Purgunnahs, or Districts, were regained by the Rajahs of Coos Beyhar, and the more powerful Zeminders of the frontier: and the limits of their respective territories became most uncertain and confused; etc."। ১৭৭৯, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৭ সালে অনুষ্ঠিত

বিভিন্ন ও ক্রমান্বয়ে চুক্তিসমূহের ফলে বৈকুণ্ঠপুরের অন্তর্গত কালাকাটা জেলা, চোয়া বন্দর এবং জলেশ জেলা ভুটানরাজের অধিকারে আসে। ১৭৮৪ সালের তেসরা জুন তারিখের রাজস্ব বিবরণী থেকে জানা যায় যে ক্যাপ্টেন টারনার (Capt. Turner) কর্তৃক কালাকাটা জেলা ভুটান সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় দশ হাজার তিনশত তেত্রিশ টাকার বিনিময়ে। এত সামান্য অর্থে অরণ্যসম্পদপূর্ণ এই লোভনীয় বাণিজ্য-পথটি বিক্রয় হয়ত ইংরাজের দুর্বলতা অথবা অদূরদর্শী কূটনীতির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে সামরিক শক্তির সাহায্যে এই সমস্ত স্থান পুনরুদ্ধার ক'রতে ইংরাজদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। বক্সা, দেওয়ানগিরি ও বিষেণ সিংহের যুদ্ধগুলি এবং ভুটানী বীরদের সঙ্গে ইংরাজ ও বাঙালী কোচ সেনানীদের হাতাহাতি সংগ্রাম চিরদিন স্মরণীয় হ'য়ে থা'কবে। এই রণক্ষেত্রগুলিও যেন অতীতের উত্তরাধিকার যা'র নীরব সাক্ষ্য বহন করে 'অরণ্যছায়ার দুর্গ' নলরাজার গড়।

নলরাজার গড়

জলপাইগুড়ি জেলায় চিলাপাতা অরণ্যে অবস্থিত নলরাজার গড়ের বিশাল ধ্বংসাবশেষে সর্বপ্রথম সুশৃংখলভাবে এক দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধান-কার্য্য সম্পাদিত হয় ১৯৬৬-৬৭ সালে পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের দ্বারা। যদিও এর পূর্বে এই পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষক ও পর্য্যবেক্ষক কিছু কিছু মতামত প্রকাশ করেন কিন্তু সেগুলির সীমাবদ্ধতা যেন কেবলমাত্র উল্লেখে অথবা আংশিক বর্ণনায় পর্য্যবসিত হ'য়েছিল। সুতরাং, কোন ক্ষেত্রেই নলরাজার গড়ের প্রকৃত গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এই শ্রেণীর একটি বিপুল ধ্বংসাবশেষের মূল চিত্রটির পুনর্বিন্যাস করতে হ'লে প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধান, খনন ও গবেষণার। চিলাপাতা অরণ্যের ছায়াচ্ছন্ন অঙ্কে শায়িত এই ভগ্ন পুরাকীর্ত্তির রহস্যগুলি যেন সুদীর্ঘকাল ধরে সমাধানের জন্য অপেক্ষমান। এই প্রাচীন দুর্গের প্রাকার, খিলান, বুরুজ, পয়ঃপ্রণালী ও কক্ষগুলি উদ্ভাসিত করেছে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের এক নূতন দিগন্ত।

১৯৫১ সালে জলপাইগুড়ি জেলার তদানীন্তন জেলা-শাসক শ্রীকরুণা কেতন সেন আই, সি, এস, পত্রদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতি। তাঁর এই গভীর আগ্রহের কারণ ছিল আলিপুর দুয়ারের তদানীন্তন মহকুমা শাসক শ্রী জে, সি, সেনগুপ্ত আই, এ, এস, মহোদয় কর্তৃক উল্লিখিত সালের মার্চ মাসে মেন্দাবাড়ী (চিলাপাতা অরণ্য পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত) ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন। শ্রী সেনগুপ্তের প্রদত্ত বিবরণীতে এই ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে এমন কয়েকটি তথ্য স্থান পেয়েছিল যা' প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট একান্ত আকর্ষণীয় ও অমূল্য বিবেচিত হ'তে পারে। সু-উচ্চ দুর্গ-প্রাকারের নিবিড় প্রস্থ ও দৃঢ়তা, খিলান-সদৃশ গবাক্ষ-পথ এবং ইঁটে বাঁধান পয়ঃপ্রণালী স্বভাবতঃই এক বিরল স্থাপত্যের ন্যায় প্রতীত হ'য়ে-

ছিল। গভীর অরণ্যে কোন প্রাচীন স্থাপত্য কিম্বা পুরাকীর্ত্তির রহস্যময় পরিবেশ চিরকালই আকর্ষণীয়। এ বিষয়ে অবিস্মরণীয় উদাহরণগুলি দেখা যাবে সুদূর মেক্সিকোয় এবং ইন্দোচীনে। ১৮৫৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি কাম্বোডিয়ার গভীর অরণ্যে ফরাসী প্রাণীবিজ্ঞানী Henri Muhot যখন প্রথম আবিষ্কার করেন অঙ্কোরের মহান পুরাকীর্ত্তি তখনকার তাঁর সেই রোমাঞ্চময় অনুভূতি আজ কাব্য অথবা উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হ'তে পারে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে বর্ত্তমান লেখক সর্ব-প্রথম নলরাজার গড় অথবা মেন্দাবাড়ী ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন ১৯৬১ সালে। এই প্রথম অভিযানে লেখকের সঙ্গী ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের অধীক্ষক ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জী এবং আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীরঞ্জিত কুমার সেন। এই সময়ে নলরাজার গড়ের ভিতরে ও চার-পাশে বিস্তৃত অরণ্য আরও গভীরতর ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই অরণ্য স্থানে স্থানে নির্মূলিত হয় বনবিভাগের কর্মসূচীর দ্বারা। ১৯৬১ সালে এই ধ্বংসাবশেষকে প্রকৃতই এক নিদ্রিত অরণ্যপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হ'য়েছিল। দুর্গের চারপাশে কোমল বালুকা-শয্যায় বিপুলায়তন হস্তী, 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার', সখড়্গ গণ্ডার ও মৃগযূথের পদ-চিহ্নগুলি সৃষ্টি করেছিল এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিমণ্ডল। এছাড়া, দুর্গ-প্রাকারের উপর দণ্ডায়মান মহীরুহগুলি যেন এক বিস্মৃত ইতিবৃত্তকে আরও রহস্যময় করে তুলেছিল। এই প্রথম অভিযানকালে স্বভাবতঃই অনুমান করা গিয়েছিল যে এই দুর্গের নির্মাণকাল গুপ্তযুগের এক অজ্ঞাত শতকে। এই অনুমানের প্রধান কারণ ছিল বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক বৃহদাকৃতি ইষ্টক-সমূহের ব্যবহার এবং প্রাকারের স্থানে স্থানে সংশ্লিষ্ট বালুকা-প্রস্তরের স্থাপত্য-কর্ম। এতদ্ভিন্ন দুর্গ-প্রাচীরে শিকড়-জড়ানো বিশালকায় বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং অভ্রভেদী চম্পক তরুগুলি সহজেই প্রমাণিত করে, যে, এই দুর্গটি পরিত্যক্ত হবার পর বহুদিন অতিবাহিত হ'য়েছে। কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীনের আরণ্যক পরিবেশে প্রায়-বিলুপ্ত প্রাচীন দেব-দেউল অথবা নগর ও জনপদগুলির মত নলরাজার গড়ও যেন

দাঁড়িয়েছিল এক মহান অতীতের নীরব প্রহরীর মত। এক কথায়, এই অবনত পুরাকীর্তির অজ্ঞাত ইতিহাস চির-ছায়াচ্ছন্ন চিলাপাতার নিভৃত বনতলকে যেন একান্ত রহস্যময় করে তুলেছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হ'য়েছে, অরণ্যের দুর্গম গভীরে আবিষ্কৃত কীর্তিগুলি চিরকালই পুরাতাত্ত্বিকের আগ্রহ সৃষ্টি করে এসেছে। এই উপলক্ষে অবশ্যই উল্লেখ করা যায় এক জার্মান পুরাতাত্ত্বিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত কলম্বিয়া রাজ্যে প্রসারিত আণ্ডিজ পর্বতমালার এক অরণ্যাবৃত উপত্যকায় পুরাতাত্ত্বিক হেরমান্ ফন ওয়ালড্ ওয়ালডেগ্ বোগোটা শহর থেকে সান অগাষ্টিন যাবার পথে দুইটি রহস্যময় দেবমূর্তি দেখে এতই অভিভূত হন যে তখন তিনি প্রায় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "On my first visit to San Augustin, my eager interest was aroused even before we reached the town. With a native guide I was riding a rough trail through the dense vegetation of the Colombian highlands on the last lap of the long journey by rail and horse-back from Bogota, when suddenly my eyes lighted upon something that almost made me fall off my horse.

Flat on their backs in the dirt and grass of a meadow lay two heavy figures of carved stone representing a god and a goddess. Each was about as tall as a man. With their long jaguar eyes, teeth and broad noses they looked like something out of a nightmare, but to me as an archaeologist they were infinitely beautiful."

(*Stone Idols of the Andes Reveal A Vanished People*, The National Geograhic, May, 1940, pp. 627).

নলরাজার গড়ের বিপুলায়তন ধ্বংসাবশেষগুলিও সৃষ্টি করেছিল বন-ভূমির গভীরে এক আশ্চর্য্য পরিমণ্ডল। প্রথম দর্শনেই অভিযাত্রীদের মানস-পটে উদিত হবে এই প্রশ্ন, এই দুর্গের প্রাচীনত্ব কতখানি এবং কোন্ রাজশক্তির উদ্যমে নির্মিত হ'য়েছিল এই বিশাল প্রতিরোধ-প্রাকার ও অপরাপর বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক স্থাপত্য-নিদর্শন? বন্য হস্তীর বৃংহণের দ্বারা অরণ্য বার বার মুখরিত হ'লেও প্রথম অনুসন্ধান-কার্য্য সম্পাদিত হয় সযত্নে এবং গৃহীত হয় শ্রেণীবদ্ধ আলোকচিত্র। প্রায়ন্ধকার আরণ্যক পরিবেশে সমস্ত কাজই দুরূহ হ'য়ে উঠেছিল। সংক্ষিপ্ত সময় ও এই প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯৬১ সালে সমগ্র দুর্গটি পরিক্রমণ করা হয় এবং একটি পূর্ণ দিন তোরসা থেকে বানিয়া পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা। দুর্গাঞ্চলে পদব্রজে পরিভ্রমণ করলেও বৃহত্তর অঞ্চল অতিক্রান্ত হয় বনবিভাগ-কর্তৃক এই উপলক্ষে নিয়োজিত একটি হস্তী-পৃষ্ঠে।

১৯৬১ সালে পরিচালিত এই অনুসন্ধান-কার্য্যের ফলে অন্তত এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে দুর্গটির প্রথম নির্মাণকাল গুপ্তযুগে বর্ত্তমান কাল থেকে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে। এর পর ধীরে ধীরে পরিচালিত হয় গবেষণা এবং এখানকার স্থাপত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বীক্ষণ। এছাড়া, ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত প্রতিটি প্রকল্প-গ্রহণ যোগ্য ঋতুতে বর্ধমান জেলার অজয়-উপত্যকায় অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবির তাম্রাশ্মীয় অধিবসতিতে উৎখনন পরিচালনার ফলে এবং ১৯৬৬ সালে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রাগৈতিহাসিক শৈলাঞ্চলে অভিযান সম্পাদনের জন্য পশ্চিম বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষে কয়েক বছর নলরাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে, ১৯৬৭ সালে গৃহীত হয় এই দীর্ঘকাল-আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প এবং এই বৎসরের মার্চ মাসে সুরু হয় যথারীতি অনুসন্ধান-কার্য্য। এই কর্মসূচীর একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল সমগ্র দুর্গটির বিভিন্ন আয়তন

সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও স্থানবিশেষে ধ্বংসস্তূপ এবং তোরসা ও বানিয়ার পাললিক বালুকারাশি এবং অরণ্যগুল্ম ও বৃক্ষাদি অপসারণ ক'রে স্থাপত্যাদির পূর্ণতর চিত্রাদি গ্রহণ অথবা পুনর্গঠন। এই ধরণের সমীক্ষা পরিচালনার ফলে দেখা গেল, এই প্রাচীন দুর্গ মৌল উদীচ্য রেখা থেকে প্রায় ৩০° ডিগ্রী পূর্ব কোণে প্রসারিত। এছাড়া, জানা গেল ধ্বংসাবশেষটি অবস্থিত ৮৯°২২´ অক্ষরেখা ও ২৬°৩৪´ দ্রাঘিমায়। একটি আভ্যন্তরীণ পরিখার দ্বারা কিছুটা লম্বাকৃতি ও চতুষ্কোণ এই দুর্গটির উত্তর-পূর্ব অংশ একটি ক্ষুদ্রতর চতুষ্কোণের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। 'মধ্যের অধুনা-বিশুষ্ক পরিখা অথবা পয়ঃপ্রণালীটি পূর্ব দিকে গভীর-অরণ্যের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে মিলিত হ'য়েছে স্বচ্ছ জল-স্রোতবাহী বানিয়া নদীর সঙ্গে। এই পরিখার অপর অংশটি মিলিত হ'য়েছে সুগঠিত প্রাকারের ওপারে দুর্গের বিস্তার-পথ অনুসারী পরিখায় অথবা কৃত্রিম জল-খাতে। স্থানে স্থানে সিঁড়িযুক্ত এই সমকোণ বাহুবিশিষ্ট "L" আকৃতির পয়ঃপ্রণালীটি চওড়ায় ১৩'২০ মিটার এবং এরদ্বারা বিচ্ছিন্ন দুর্গের অংশটি দৈর্ঘ্যে ১১৩'৮০ মিটার এবং প্রস্থে ৪৯'৪০ মিটার। নলরাজার গড়ের এই উপবিভাগের পশ্চিম ধারটিতে কোন খাঁজ না থাকলেও এর বিপরীত দিকে মূল দুর্গের প্রাকারে সরল কোণ-বিশিষ্ট এক প্রশস্ত খাঁজ দেখা যায়। একটি মুক্ত কক্ষের মত এই খাঁজটি যেমন এখানে প্রাচীরকে কতকটা বুরুজে রূপান্তরিত করেছে তেমন সুরক্ষিত অংশটি সৃষ্টি করতে সক্ষম নৌপথের এক গোপন আশ্রয়স্থল। নানাকারণদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, অতীতে এখানে ছিল দুর্গের এক গোপন বন্দর। সে যুগে কামরূপের প্রতিবেশী উত্তর বঙ্গে প্রবল বর্ষায় নৌচলাচলের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এই পয়ঃপ্রণালীটি যে কত সযত্নে নির্মিত হ'য়েছিল তা' উপলব্ধি করা যায় দুই দিকের সঙ্কীর্ণ ধাপযুক্ত প্রাচীর অথবা বাঁধ দেখে। ইটে বাঁধানো এই ঢালু বাঁধ যেন প্রাচীন বাস্তুকারদের অভ্রান্ত গণনা ও কর্মকৌশলের সাক্ষ্য দেয়।

নলরাজার গড়ের প্রাচীর অথবা প্রাকারগুলির মর্য্যাদাপূর্ণ

আকৃতি নিঃসংশয়ে গুপ্তযুগের এক অমূল্য স্মারক। যদিও এই প্রাচীরের উপর দিকের অজ্ঞাত-সংখ্যক ইষ্টক-স্তর আজ বিলুপ্ত তবুও ভিত্তিমূলে সঞ্চিত ধ্বংসস্তূপ থেকে তার উচ্চতা সাধারণতঃ চার থেকে পাঁচ মিটার। মলরাজার গড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রাকারে উন্মুক্ত দুইটি খিলান প্রকৃতই উল্লেখনীয় কারণ, এই ধরণের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অর্থজ্ঞাপক। এই খিলানের প্রকৃত তাৎপর্য্য অথবা অবস্থিতি নিরূপণ করবার জন্য দক্ষিণ-প্রাকারের সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়। এখানে গড়িয়ে পড়া ইটের স্তূপ, পাললিক বালুকা ও তরুলতা অপসারণ ক'রে দেখা যায় যে অন্তত এই অংশটিতে দুর্গ-প্রাচীর খুবই উঁচু ছিল। সর্বনিম্নে নির্মিত দীর্ঘাকৃতি প্রস্তরখণ্ডে বাঁধানো সিঁড়ির উপর গঠিত হয় এই প্রাকার যা'র উচ্চতা ভিত্তি-মূল থেকে ৭'৫ মিটার অর্থাৎ প্রায় ২৩' ফিট। অভগ্ন অবস্থায় এই সুদৃঢ় প্রাকারটি নিশ্চিতভাবে আরও অনেকটা উঁচু ছিল। এই উচ্চতা যে প্রায় ৩০' ফিটের নিকটবর্ত্তী ছিল সে বিষয়ে অনুমান করতে দ্বিধা নেই। ভূনিম্নে জলবাহী স্তর পর্য্যন্ত প্রসারিত পাথরের ধাপগুলি এবং প্রাচীরের সংশ্লিষ্ট অংশ সম্ভবতঃ ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিলানের নিম্ন-স্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত দেখা যায় দুইটি বাহু-প্রাচীর যা'দের প্রথম-দৃষ্টে বুরুজ বলে মনে হ'তে পারে। এই বাহু-প্রাচীরদ্বয় একান্ত সুদৃঢ় ও বিস্তৃতায়তন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় খিলানের গঠন ও বৈশিষ্ট্য। খিলান-তল ধাতুদণ্ডে সংযোজিত প্রস্তর-খণ্ডসমূহে বাঁধানো এবং বহির্ভাগ জল-নালীর মত কিছুটা এমনভাবে অগ্রবর্ত্তী, যে, তার সঙ্গে দূরবর্ত্তীভাবে তুলনীয় ভারতীয় বাস্তুশিল্পে প্রচলিত মকর-জিহ্বা। স্বভাবতঃই, এই খিলানটি অতীতে ব্যবহৃত হ'য়েছে দুর্গের অভ্যন্তর-প্রদেশে সঞ্চিত বারি নিষ্কাষণের নিমিত্ত। খিলানের আকৃতি কতকটা সূক্ষ্মাগ্র অর্ধ-বৃত্তের মত এবং তার ধারে তিন প্রস্থ ইট দেখা যায় লম্বাভাবে শোয়ানো অবস্থায়। এই গবাক্ষ-পথের পশ্চাতে ইংরাজী "S" অক্ষরের মত একটি বাঁকা পথ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক

কারণ, তার সুগমঞ্জস গঠনকে সুদৃঢ় করা হ'য়েছে ইষ্টকস্তম্ভসমূহ কাৎ অবস্থায় ও আড়াআড়িভাবে সাজিয়ে। এই রীতিটি নিশ্চিত-ভাবে নিয়োজিত বারি-স্রোত বহনের নিমিত্ত। সম্প্রতি, দক্ষিণ ভারতে থঞ্জবুর জেলায় অবস্থিত কাবেরীপত্তিনমের ধ্বংসাবশেষ পরিচালিত খনন-কার্য্যের ফলে এর সঙ্গে কতকটা তুলনীয় একটি জল-প্রণালী আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কাবেরীপত্তিনমের অন্তর্ভুক্ত বনগিরিতে উন্মোচিত এই কীর্তিচিহ্নটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখা যায় খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে প্রচলিত কৌলালের নিদর্শন। স্বভাবতঃই, দৃঢ় বুনিয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নলরাজার গড়ের মনোরম প্রবাহ-পথটির চেয়ে একটি অর্ধ-বৃত্তাকার পুষ্করিণীর অবয়ব এই আকর্ষণীয় প্রণালীটি অন্তত কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার। বনগিরিতে আবিষ্কৃত এই জল-প্রণালীটি সম্বন্ধে প্রকাশিত বিবরণীর মূল অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"A brick structure almost semicircular on plan, with nearly 2m. high walls and an internal diametre of 8 m., laid bare at Vanagiri, appears to be a small wa'er-reservoir fed by a 83cm. wide brick-built inlet channel from the river Kaveri........The occurrence of the megalithic Black-and-Red and the Rouletted wares in layers contemporary with the structure helps to determine its date, which may be fixed around first-second century A.D. In this connection it may be noted that the early Tamil Sangam literature refers to the construction of tanks and irrigation-channels by the Chola kings." (*Indian Archaeology-A Review*, Edited by the Director General of Archaeology In India, 1963-64, p. 20, pl. XIV.)।

সমগ্র নলরাজার গড়ের অবস্থান দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই দুর্গটি অতীতে এক বা একাধিক বেষ্টনকারী পরিখার দ্বারা

সুরক্ষিত ছিল এবং ফলে অনুভূত হ'য়েছিল জল-নিকাষণের প্রয়োজন। দুর্গের দু'টি খিলান-পথ এবং অন্তর্ভেদী পয়ঃপ্রণালীটি স্বভাবতঃই অতীতে বর্ষায় প্লাবিত বারি-স্রোত অপসারণে সাহায্য করেছে। জল-নিকাষণের এই পদ্ধতি নিঃসংশয়ে সামরিক স্থাপত্যের এক অতি উন্নত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে, এই খিলান-পথটিই ভারতের এক অন্যতম প্রাচীন 'কালভার্ট'। নিকাষিত বারি নিম্নে পতিত হ'য়ে মিশ্রিত হ'ত এক গভীর পরিখায় যা'র চিহ্ন আজও বিদ্যমান। শুষ্ক ঋতুতে এই খিলানটিই ব্যবহৃত হ'তে পারত প্রতিরোধের নিমিত্ত। লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজের পক্ষে এই গবাক্ষ-পথটি (বিস্তার ১·৬০ মিটার, উচ্চতা ১·৫০ মিটার) নিশ্চিতভাবে ছিল এক আদর্শ স্থান।

নলরাজার গড়ের সুদৃঢ় প্রাচীর অথবা প্রাকার ভারতের এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। এই প্রাচীর সাধারণতঃ প্রস্থে ১·৪০ মিটার এবং দু'টি অগ্রবর্তী বুরুজ চওড়ায় ৪·৫০ মিটার। দুর্গের পশ্চিম প্রাকারে নির্মিত দুটি বুরুজের গঠন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ, এ দু'টির অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে সারিবদ্ধ কুলুঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট নালী অথবা চিম্‌নি। এই বুরুজদ্বয়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে অবস্থিত তার দৈর্ঘ্য ৩৩·৫০ মিটার এবং দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ যেটি অপেক্ষাকৃত উত্তর দিকে অবস্থিত তার দৈর্ঘ্য ৭৬·২৫ মিটার। এই বিপুল আয়তন স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক। এই বুরুজদ্বয়ের নীচেই দেখা যায় এক সুদীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পাটাতন। এই অনুচ্চ পাটাতন অথবা স্কন্ধের উপর বুরুজের বর্তমান উচ্চতা ২·৪৪ মিটার। গড়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য দক্ষিণ দিকের বুরুজটিকে তরু-গুল্ম ও বালুকা-গর্ভ মৃত্তিকা অপসারণ করে উন্মোচিত করা হয়। এই সময়ে এখানে পনেরটি নল-বিশিষ্ট (chimneyed) কুলুঙ্গি দেখা যায়। এই কুলুঙ্গিগুলির নিম্নাংশ ৪৪ সেন্টিমিটার বিস্তৃত এবং এগুলির উচ্চতা ৬৫ সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটি কুলুঙ্গির সঙ্গেই দেখা যায় একটি নল প্রসারিত হ'য়েছে বুরুজের অভ্যন্তর দিয়ে। দগ্ধ মৃন্ময়-চক্রেরদ্বারা নির্মিত নল অথবা চিম্‌নিগুলি বুরুজের উপরিভাগে

যুক্ত হ'য়েছে প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার বিস্তৃত গোলাকৃতি অথবা হরতনের আকৃতি চুল্লির মত। কুলুঙ্গিসমূহের নিম্নভাগ যেমন চালুধরণের, নল-গুলিতে তেমন অগ্নি-প্রজ্বলনের চিহ্ন দেখা যায়। পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা স্বভাবতঃই সন্দেহ থাকেনা যে, এই নলযুক্ত খোপগুলি অতীতে ছিল এক শ্রেণীর ধাতু গলাবার চুল্লি। যদিও ১৯৬৭ সালের পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা নলরাজার গড়ে কোন ধাতুনির্মিত অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়নি তথাপি এখানে যে প্রস্তরখণ্ডসমূহ সংযোজনার জন্য অসংখ্য লৌহ কীলক (dowel) ব্যবহৃত হ'য়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে চিলাপাতার আর্দ্র, লবণাক্ত, অরণ্যাকীর্ণ ও বালুকাময় পরিবেশে কোন প্রাচীন লৌহ-অস্ত্র ও সামগ্রীর পক্ষে পরিচয়-যোগ্য আয়তনে বিদ্যমান থাকা সাধারণ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অবশ্য, মৃত্তিকার ইতিহাস ও যুগ-যুগান্তর ধরে সঞ্চিত সংস্তরগুলির রাসায়নিক বৈচিত্র্য ও রহস্য অবগত হওয়া প্রকৃত উৎখনন ভিন্ন সম্ভব নয়। এমনও হ'তে পারে, যে, ভূনিম্নের কোন বিশেষ পরিমণ্ডলে আজও সুরক্ষিত আছে অতীতের একান্ত ভঙ্গুর নিদর্শনগুলি। এই ধরণের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পুরাতাত্ত্বিক উৎখননের ইতিহাসে বিরল নয়।

প্রকৃতপক্ষে, নলরাজার গড়ের পশ্চিম প্রাকারের অন্তর্ভুক্ত এই নলযুক্ত কুলুঙ্গিগুলি সমগ্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের এক আশ্চর্য্য বিষয়বস্তু। এই দুর্গ যেন সাম্রাজ্যিক গুপ্তযুগের প্রতিরোধ-চিন্তার এক অক্ষয় কীর্তি। পশ্চিম প্রাকারের দীর্ঘতর বুরুজটির গায়েও দেখা গেছে একই শ্রেণীর কুলুঙ্গির আরেকটি সারি। তুলনীয় বিচারে বলা চলে যে ধ্বংস-স্তূপে আবৃত এই বুরুজটিতে সম্ভবতঃ ত্রিশটিরও বেশী এই ধরণের "চুল্লি" ছিল।

নলরাজার গড়ের চারদিকে চারটি প্রবেশ-পথের চিহ্ন আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এইগুলির মধ্যে পূর্বপ্রাকারে উন্মুক্ত প্রবেশ-পথটি সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও অরণ্যের ক্রম-বর্ধমান বিপদ সত্ত্বেও ১৯৬৭ সালের মে মাসে পরিচালিত হয় প্রয়োজনীয় উৎখনন এই প্রবেশ-পথটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহস্য সমাধানে। এই প্রবেশ-কক্ষটি

কতকাংশে উন্মুক্ত হ'লে উপলব্ধি করা যায় এক ত্রুটীহীন ও সুদৃঢ় নির্মাণ-রীতিকে। এখানে দেখা যায় অপরাপর কয়েকটি অংশের মত ইটের গ্রন্থনায় সঙ্গে কিছুটা পাথরের সমাবেশ। একই মাপের ৬'১০ মিটার দীর্ঘ অপর একটি প্রবেশ-কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে পশ্চিম-প্রাকারের অবয়বে। এই ধরণের বিভিন্ন সামঞ্জস্য প্রমাণিত করে, যে, অতীতে নলরাজার গড় নির্মিত হ'য়েছিল এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে। এখানে উল্লেখনীয়, যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রাকারের খিলানদ্বয়ের সঙ্গে যথাক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম প্রাকার-সীমার দূরত্ব প্রায় একই পরিমাপের। প্রথমটির দূরত্ব ৮৩'৮৫ মিটার এবং দ্বিতীয়টির ব্যবধান ৮৫ মিটার। অবশ্য, এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের প্রধান অন্তরায় ছিল নিবিড় অরণ্য ও প্রাকারের নীচে সঞ্চিত গড়ানো ইটের (rolled) ধ্বংসস্তূপ।

সম্ভবতঃ শত্রুর অগ্রগতি রোধ করবার জন্য নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের প্রবেশ কক্ষটির দ্বারদেশ ছিল সুরক্ষিত। এই প্রসঙ্গে তুলনায়, কোচবিহারের অন্তর্গত রাজপাট অথবা গোসানীমারির প্রাচীন দুর্গ যা'র প্রবেশ-দুয়ারগুলিতে (শিলদুয়ার, বাঘদুয়ার, জয় দুয়ার, সন্ন্যাসী দুয়ার, হেঁকো দুয়ার ইত্যাদি) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এছাড়া, গোসানীমারির দুর্গ ও নলরাজার গড় এই দুইয়েরই একটি তুলনীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই দুইটি দুর্গের মধ্যে একদা প্রবাহিত ছিল অতীতের স্রোতোধারা। গোসানীমারি দুর্গের মধ্যে একদা প্রবাহিত হ'য়েছে সিঙ্গিমারি নদী এবং নলরাজার গড়ে অতীতে প্রবাহিত হ'য়েছে বানিয়া নদী ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক সুরক্ষিত ও সুসমঞ্জস কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী (aqueduct)। ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিল্টন গোসানিমারি দুর্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। এই দুর্গের বিপুল মৃণ্ময় প্রাকার, বিস্তৃত পরিখা এবং মধ্যে নির্মিত রাজপাটের উচ্চতা দেখে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহ্‌মেদ বঙ্গভাষায় লিখিত তাঁর অভিমত

মূল্যবান গ্রন্থ "এ হিস্ট্রি অফ কুচবিহার" (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০)এ লিপিবদ্ধ করেছেন "পূর্বে অথবা পরবর্তীকালে সমগ্র সুবে বাঙ্গালায় যে সমস্ত দুর্গ নির্মিত হ'য়েছিল, তুলনায় সেগুলির একটিও কামতাপুরের সমকক্ষ ছিল না। এই দুর্গের পরিধি প্রায় ঊনবিংশ মাইল ছিল এবং প্রবেশ-দ্বারগুলি ব্যতীত গড়ের চারিদিকের অত্যুচ্চ প্রাকার মৃত্তিকা-নির্মিত ছিল।" এ থেকে প্রমাণিত হয় ১৯৩৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশনের সময়েও নলরাজার গড়ের বিপুল বৈভবকে কতটা অন্তরাল করে রেখেছিল চিলাপাতার প্রাচীন অরণ্য। মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধ্বংসাবশেষ অবগুণ্ঠিত ছিল মহীরূহগুলির ঘন পত্রচ্ছায়ায়। গোসানীমারি দুর্গের সঙ্গে অবশ্য কতকটা তুলনা করা চলে হুগলী জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গড মন্দারণ দুর্গের ধ্বংসাবশেষকে। আমোদর নদী বেষ্টিত এই দুর্গের সু-উচ্চ কর্দম-প্রাকার, পাষাণ-প্রাচীর এবং অপরাপর গঠন-বৈচিত্র্য প্রকৃতই উপযুক্ত গবেষণা ও সমীক্ষার বিষয়-বস্তু। গড় মন্দারণের বিচিত্র পুরাকাহিনী অবশ্য আরেক ইতিহাস।

নলরাজার গড়ের ইটের আয়তন সাক্ষ্য দেয় গুপ্ত-রীতির। সেন্টিমিটার হিসাবে এই ইষ্টকসমূহের বিভিন্ন পরিমাপ নিম্নরূপ :

দৈর্ঘ্য		প্রস্থ		স্থূলত্ব
১৯	×	২০	×	৪
৫৬	×	২২	×	৫
২৭	×	২২	×	৫
২৫'৫	×	২০	×	৪
২৮	×	২৩	×	৫
১৮	×	২৩	×	৫
২২	×	১৮	×	৫
২৫'৫	×	২২	×	৬
২০	×	১৮	×	৪
৪১	×	২২	×	৫
৩৮'৫	×	২৫'৫	×	৫
২৫'৫	×	২৮	×	৫

বর্ণিত ইটগুলি সবই চুল্লিতে পোড়ানো এবং এগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর ক'রে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—

(ক) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দগ্ধ এবং কমলা রঙের মসৃণ প্রলেপ মাখানো। কোন কোন ক্ষেত্রে সুসংযোজনার জন্য এগুলির এক পিঠের কেন্দ্রাঞ্চলে শঙ্কচ্ছেদের চিহ্ন বিদ্যমান।

(খ) কিছুটা কোমলভাবে অথবা স্বল্পতর তাপে পোড়ানো ও বিবর্ণ ইট।

এই পার্থক্য থেকে অনুমান করা সঙ্গত হবে যে গুপ্তযুগে এই দুর্গকে সম্ভবতঃ একাধিকবার স্থানে স্থানে সংস্কার করা হ'য়েছিল। দুর্গের পশ্চিম প্রাকারের নিম্নে প্রসারিত অনুচ্চ প্রাচীর অথবা 'পাটাতন'টি-ও নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় এখানকার প্রাচীনতম নির্মাণ যুগের। এই প্রাচীনতম যুগটি প্রাক্-গুপ্তযুগের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে উপযুক্ত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়নি। একমাত্র বিস্তৃত ও সমান্তরাল উৎখননের দ্বারাই এর প্রকৃত মীমাংসা সম্ভব।

নলরাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালনা ক'রে দুর্গের অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। এই অভ্যন্তরভাগ আজ কেবল প্রতীয়মান হয় সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত এক দুর্ভেদ্য বনভূমির মত। এখানে বারংবার পরিভ্রমণ ক'রেও কোন সুস্পষ্ট ধ্বংসাবশেষ অথবা হর্ম্যাদি দৃষ্টি-গোচর হয়নি। কেবলমাত্র এখানে দেখা গেছে একাধিক পুষ্করিণী ও উচ্চভূমি। বহুযুগ ধরে সঞ্চিত অরণ্যের পত্র-গুল্মজাত বালিমাটি যেন দুর্গের রহস্যময় অভ্যন্তরভাগটিকে আবৃত করে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযাত্রীদের মনে দুইটি ধারণা প্রতিভাত হ'তে পারে, যথা,

(ক) অতীতে দুর্গের অভ্যন্তর-ভাগে দারুময় শিবির অথবা গৃহাদি ছিল যা' স্থানীয় আবহাওয়া ও নিসর্গ-পরিবেশে বিনষ্ট কিম্বা সমাধিস্থ হ'য়েছে। নিম্ন ও উর্দ্ধ হিমালয় অঞ্চলে দারুময় গৃহাদির বাহুল্য সর্বজনবিদিত।

(খ) দুর্গের অভ্যন্তরে ভূমি-গর্ভে ইষ্টক-নির্মিত হর্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষ

নিহিত আছে যা' স্বভাবতঃই বিস্তৃত খনন-কার্য্যের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব।

নলরাজার গড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোকপাত করে দুর্গের পূর্ব-প্রাকারের সন্নিহিত অঞ্চলে ছড়ানো প্রস্তর-নির্মিত বিভিন্ন দেব-দেউলের ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষগুলির অবস্থান দেখা যায় পূর্ব-প্রাকার ও তার নিকটবর্ত্তী পরিখার মধ্যস্থলে। প্রাকার থেকে এই পরিখার দূরত্ব ১৭৬ মিটার। এই পরিখা অথবা কৃত্রিম স্রোতোপথটি কিছু দূরে মিলিত হ'য়েছে বানিয়া নদীর সঙ্গে। ক্রমান্বয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে অবশ্য এখানে দুইটি পরিখার পরিচয় পাওয়া যায়। সমান্তরালভাবে প্রসারিত পরিখাদ্বয়ের বিস্তৃতি অন্ততঃ একটি স্থানে যথাক্রমে ২৮ মিটার এবং ১৬ মিটার।

পূর্ব-প্রাকারের সমীপে ও পরিখার তীরে প্রসারিত দেব-দেউলের ধ্বংসাবশেষগুলি প্রকৃতই আকর্ষণীয়। এগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে, একদা এখানে একাধিক মন্দির নির্মিত হ'য়েছিল, যেগুলির ক্ষুদ্র ও বিপুলায়তন অংশগুলি আজ ছড়িয়ে আছে এক জনহীন অরণ্য-নিকেতনের পাশে এক প্রাচীন চম্পকবনে। এই মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ যে ভিন্ন ভিন্ন যুগের সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও এই মন্দির-সমষ্টির অন্যতম নির্মাণকাল গুপ্ত ও পালযুগে তবুও মনে হয় মধ্যযুগে খেন ও কোচ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকালেও হয়ত এইখানে দেউল-নির্মাণ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেনি। নলরাজার গড়ে আবিষ্কৃত বিভিন্ন পুরাকার্ত্তিগুলির মধ্যে গুপ্তযুগের শৈলীর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব নিদর্শনাদির মধ্যে অন্যতম কুণ্ডলিত লতা, হংস ও গবাক্ষ-খোদিত পাষাণখণ্ডসমূহ। চিত্রার্দ্ধ (relief) রীতিতে রূপায়িত একটি হংস অথবা বিহঙ্গকে দেখা যায় গুপ্তযুগের রীতি-অনুসারী কুণ্ডলিত বল্লরীর মধ্যে। বালুকা-প্রস্তরে খোদিত গবাক্ষটির প্রাচীন রূপ নিঃসংশয়ে সে যুগের এক সুশোভন ও স্বচ্ছন্দ শিল্পকৃতির পরিচায়ক। এই নিদর্শনটি স্বভাবতঃই কোন মন্দিরের এক সুরম্য অঙ্গ-শিখরের সৌন্দর্য্যকে প্রতিফলিত করে। এই শ্রেণীর

অঙ্গ-শিখর যে অন্তত গুপ্তযুগের শেষার্দ্ধে প্রচলিত স্থাপত্য ও কারুশিল্পের সাক্ষ্য বহন করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের পাশে আবিষ্কৃত ভগ্ন মন্দির-সমষ্টির মধ্যে পালযুগের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গড়িয়ে পড়া কারুমণ্ডিত দ্বার-শীর্ষ (lintel) এবং একদা মন্দির-চূড়ায় স্থাপিত একটি সকলস আমলক। নলরাজার গড়ের এই পুরাকীর্ত্তিগুলি একটি সুবিস্তৃত এলাকায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, যে, তার ফলে দর্শকদের ধারণা হবে যে একদা এখানে বিদ্যমান ছিল বিভিন্ন দেব-দেউল যা'দের সুরম্য স্থাপত্যের পরিচয় দেয় বহু-সংখ্যক কারুমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড। একদা ধাতু-কীলক সংযোজিত স্থাপত্যের এই অংশগুলি বেশীরভাগই বালুকা-প্রস্তরের হ'লেও এগুলির মধ্যে হিমালয় থেকে সংগৃহীত বলে অনুমিত গ্র্যানাইট পাথরের নিদর্শনও বিদ্যমান। পার্শ্ববর্ত্তী পরিখার প্রস্থচ্ছেদ (section) পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, যে, এই মন্দির-সমষ্টি নির্মিত হ'য়েছিল পোড়া ইটের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর। এখানকার মন্দিরগুলির আয়তন সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হবে একটি অসমাপ্তভাবে নির্মিত স্তম্ভের আকৃতি দেখে। এই খাঁজকাটা স্তম্ভটি ৪.১৫ মিটার দীর্ঘ এবং .৫৭ মিটার প্রশস্ত। অর্থাৎ, এই স্তম্ভের উচ্চতা ছিল ১৩ ফুটের উপর। সেন্টিমিটার হিসাবে এখানে আবিষ্কৃত অপরাপর বিভিন্ন প্রস্তর-খণ্ডগুলির আয়তন নিম্নরূপ :

দৈর্ঘ্য		প্রস্থ		স্থূলত্ব
৪১	×	৪১	×	৩১
৫০	×	২৫.৫	×	৩১
৬০	×	৩৭	×	৩১
৩৮	×	৩৬	×	২৫.৫
৪৮	×	৩১	×	২৫.৫
৮৪	×	৩৪.৫	×	৩১
৫১	×	৩১	×	২৫.৫
৫৬	×	২৫.৫	×	২৫.৫

এই ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একটি সকলস আমলক দেখে অনুমান করা যায় যে এখানে অন্তত একটি "রেখ" শ্রেণীর দেউল ছিল। একদা সুপ্রাচীনকালে জলপাইগুড়ি জেলায় যে একাধিক মন্দির ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বটেশ্বর, জল্পেশ্বর, পূর্বদহ ও সোদরখইয়ের ভগ্ন স্থাপত্যগুলি সাক্ষ্য দেয় প্রাচীন ধর্মীয় প্রেরণা ও শিল্প-মানসের।

নলরাজার গড়ে আবিষ্কৃত প্রস্তর-নির্মিত বিভিন্ন দেব-দেউলের ধ্বংসাবশেষগুলি দেখে প্রশ্ন জাগে যে এগুলির বিলুপ্তি এত শোচনীয় কেন? এই একই প্রশ্ন উদিত হবে বটেশ্বর ও পূর্বদহের ভগ্নস্তূপ দেখে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মন্দিরের চূড়াগুলি ধ্বসে গেছে যেন প্রাকৃতিক কারণে। আক্রমণকারীর প্রতিশোধ-স্পৃহা অথবা ধর্মান্ধতায় যে এই বিপর্যয় সাধিত হয়নি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সাধারণতঃ মণ্ডনশিল্পের সৌকার্য্যে অথবা দ্বারপাল কিম্বা স্থাপত্যে খোদিত দেব-মূর্ত্তির গায়ে মানুষের হস্তকৃত ধ্বংসসাধনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি। অথচ অতিকায় অথবা ভারী প্রস্তর-খণ্ডগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, যে, বিস্মিত না হ'য়ে উপায় নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, কোচ সম্রাট নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৫৮ খৃস্টাব্দে উত্তর-বঙ্গে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প সংঘটিত হ'য়েছিল। খুনলোং ও খুনলাই বুরুঞ্জি (ইংরাজী অনুবাদ, প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৯) পাঠ করে তদ্‌রচিত "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থে ঐতিহাসিক খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহ্‌মেদ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, যে, এই রাজার রাজত্বকালে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে "এই প্রদেশে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ভূমি বিদীর্ণ হইয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে জল, বালুকা, ভস্ম এবং প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী নিত্যানন্দের তিরোভাবের পরও বঙ্গদেশে এক ভীষণ ভূমিকম্প হবার সংবাদ পাওয়া যায় ("কোচবিহারের ইতিহাস," প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩, টিকা)।

নলরাজার গড়ের শেষ ইতিবৃত্ত যেমন অজ্ঞাত তেমন রহস্যাবৃত তার প্রথম নির্মাণকাল। এই দুর্গের আকৃতিগত বৈচিত্র্য ও তার ইতিহাস আজ সৃষ্টি করেছে পুরাতাত্ত্বিকের গভীর আগ্রহ। এখানে

সর্বাধিক উল্লেখনীয়, যে, নলরাজার গড়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে চীন-দেশের 'সুই' ও 'টাং' রাজবংশদ্বয়ের রাজধানী চাঙ-আন-এর প্রাকার ও পরিখা-বিন্যাসের। শেন্‌সি প্রদেশে পীত নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এই নগরীর গৌরব বিশেষভাবে স্থায়ী ছিল খৃষ্টীয় ৫৮৩ থেকে ৯০৪ পর্য্যন্ত। সম্প্রতি Jaqueline Tyrwhitt কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি নিবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায়, চাঙ-আন্ চতুষ্কোণ প্রাকারের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং দুর্গ-মধ্যে বিভিন্ন জল-স্রোত প্রবাহিত হ'ত পার্শ্ববর্ত্তী নদীগুলির বাহু হিসাবে (*The City of Ch'ang-An, Capital of the T'ang Dynasty of China*. The Town Planning Review, Published by the University of Liverpool, Great Britain, vol, 39, no. 1, April, 1968, pp. 21-37)। এছাড়া, এই সুরক্ষিত নগরীর আরও বৈশিষ্ট্য ছিল রাজপথসমূহের সমান্তরাল ও সমকোণ প্রসারণ ও পারস্পরিক বিন্যাস, অগ্রবর্ত্তী কক্ষ অথবা হর্ম্য-সংলগ্ন প্রবেশ-দ্বার এবং একটিমাত্র প্রাচীরের সঙ্গে গঠিত সুদীর্ঘ বুরুজের ন্যায় অবয়ব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকাংশে স্মরণ করিয়ে দেয় নলরাজার গড়ের প্রতিরক্ষা-স্থাপত্য ও ভিত্তি-পরিকল্পনাকে। এখানে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে নলরাজার গড়ের অভ্যন্তর প্রদেশে কোন উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়নি কেন? প্রাসঙ্গিক কারণেই স্মরণ রাখতে হবে, যে, চাঙ-আন্-এর পূর্ণ বর্ণনা সংগৃহীত হ'য়েছে প্রাচীন মানচিত্রগুলির উপর নির্ভর করে। এই মানচিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম 'চিং' রাজবংশের রাজত্বকালে শু-সুং রচিত মূল্যবান নক্সাটি। এছাড়া, সাম্প্রতিক যুগে জাপানী-গবেষক হিরাওকা কাকেও এবং আদাচি কাকেওর প্রচেষ্টাও এই প্রসঙ্গে পুরাতাত্ত্বিককে সাহায্য করবে। তাঁদের গবেষণার ভিত্তি অবশ্যই চাঙ-আন সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন প্রাচীন বর্ণনা যাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক স্থাপত্য-কর্ম তথা নগর-বিন্যাসের বহু মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে। অপরপক্ষে, চিলাপাতার অরণ্য-ছায়ায় আবিষ্কৃত নলরাজার গড় সম্বন্ধে কোন তুলনীয় প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করা পুরাতাত্ত্বিকের অতি

বিরল সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে। এছাড়া, এ বিষয়ে মত-দ্বৈধতা নেই, যে, অপরাপর সুরক্ষিত নগরীসমূহের মত চাঙ-আন এর প্রাকার ও প্রবেশদ্বারগুলি স্থায়ী উপাদানে গঠিত হ'লেও অভ্যন্তর-ভাগের গৃহাদি সাধারণতঃ নির্মিত হ'য়েছে অস্থায়ী পদার্থের দ্বারা। রাজপ্রাসাদ ও মন্দির থেকে সাধারণ কুটীর পর্য্যন্ত সবই নির্মিত হ'য়েছে কর্দম, অদগ্ধ ইট, টালি এবং কাঠ দিয়ে। এই প্রসঙ্গে Jaqueline Tyrwhitt-এর মন্তব্যাদি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল: "A major difference is the part played by walls and gates in the Chinese city. It seems that, from very early times, Chinese buildings, even palaces and temples, have tended to be ephemeral constructions—usually built of perishable materials—whereas the city walls and the compound walls have been considered as permanent structures to be constantly kept in good repair by community effort. Their few entrance gates were given such importance that their superstructure dwarfed many public buildings."।

চাঙ-আন এর আভ্যন্তরীণ গৃহাদি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "The buildings themselves were mostly one and two storey structures, with elaborate roofs, organised around a complex of courtyards. The materials used for palaces, temples and simple houses were all the same as those that had been used over the past millennium: rammed earth, unbaked bricks, timber and tile."। অস্থায়ী উপাদানে গঠিত রাজপ্রাসাদ, দেউল ও গৃহাদি নির্মাণের দৃষ্টান্ত সমূহ অবশ্য দেখা যাবে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন স্থাপত্য-রীতির পটভূমিকায়। মৌর্য্য সম্রাটের দারু-নির্মিত প্রাসাদের গৌরবময় সৌষ্ঠব সর্বজনবিদিত। 'ক্লাসিক্যাল' গ্রীক বিবরণীসমূহে এই নয়নাভিরাম রাজপ্রাসাদের স্তুতি রচনা করেছেন ঈলিয়ান। তাঁর

বর্ণনায় এই দারু-নির্মিত হর্ম্যটি পারসীক রাজপ্রাসাদগুলির চেয়েও অধিকতর সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল।

১৯৬৭ সালে নলরাজার গড়ে পরিচালিত অনুসন্ধান-কার্যের ফলে এক দিকে যেমন অনুমান করা যায় যে, প্রাকার-বেষ্টিত এই দুর্গে একদা নির্মিত হ'য়েছিল দারু-নির্মিত গৃহাদি যাদের সঙ্গে তুলনীয় গৃহসমষ্টি আজও দেখা যাবে হিমালয়ের উপত্যকায় ও সানুদেশে, তেমন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা, অতীতেও সংরক্ষিত ভূভাগটিতে বিভিন্ন উচ্চতা পরিলক্ষিত হ'ত। চাঙ-আন নগরীর অভ্যন্তর প্রদেশেও যে ঢালু ও উচ্চ ভূমি ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় আদাচি কিয়োকুর মানচিত্রে। চাঙ-আন শহরের মধ্যে আনীত খাল অথবা স্রোতোপথগুলির প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। বানিয়া নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বাঁধানো খালটি যেমন নলরাজার গড়ের মূল দুর্গটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত ক'রেছে তেমন পশ্চিম দিকের পরিখাটি দুর্গকে বিচ্ছিন্ন করেছে নিকটবর্ত্তী. এক তুলনীয় ধ্বংসাবশেষ থেকে। দুর্গপুরী চাঙ-আন-এর খালগুলি সম্বন্ধে Jaqueline Tyrwhitt সংগৃহীত বৃত্তান্ত নিম্নরূপ :

"The Sui Dynasty had made three canals to bring water into the city ; the Dragon Head Canal from the Chan river in the east ; the Yong-an Canal in the south from the river Chiao and the Ch'ing-ming Canal, also in the south, from the Hsue river. A century and a half later, in A.D. 742, the Huang Canal was made, bringing water into the south-east corner of the city and creating a large lake, the Serpentine, which was later surrounded by a beautiful park widely renowned for its hibiscus trees. At about the same time the Ts'ao canal was brought into the western market from the river Yu, largely to transport wood and charcoal. Some time later

this canal was extended into the Imperial Palace and also across the city to link up the Dragon Head Canal, thus uniting the east and west water system." (*Ibid*, p. 26) ।

বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চাঙ-আন (বর্তমান হ্‌সি-আন) এর শিল্পে বৌদ্ধ মূর্তির বিশেষ আবির্ভাব দেখা যায়। এই ধরণের কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি হ্‌সি আন প্রাদেশিক চিত্রশালায় (Hsi-an Provincial Museum) রক্ষিত আছে। চাঙ-আন নিবাসী ভাস্করদের এক অমূল্য কীর্তি বোস্টন যাদুঘরে রক্ষিত অবলোকিতেশ্বরের একটি দণ্ডায়মান প্রস্তর-মূর্তি, যা'র রেখা, ধ্যান ও ভঙ্গিমায় ভারতীয় প্রেরণা সমুজ্জ্বল। Lawrence Sickman এবং Alexander Soper এর মতে,

'This, too, is a work of the Ch'ang-an sculptors, and its affinities with Indian concepts are evident in the fleshy and sensuous modelling of hands, feet and face, as well as in the profusion of jewellery. Although the weight rests on the left leg, the right knee is advanced, and there is a slight thrust to the right hip, the *dehanche* pose so beloved by the sculptors of India is very timidly essayed". (*The Art And Architecture Of China*, Great Britain, 1960, p. 60) ।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বিবেচনায় এমন ধারণায় উপনীত হওয়া যায়, যে, বিভিন্ন উত্তর-দেশীয় আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যই নলরাজার গড়ের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এক বিশেষ সামরিক নীতিকে গ্রহণ করা নিশ্চয়ই প্রতিভা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচায়ক। কুশলী রণনায়ক গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজনৈতিক সৌভাগ্যের অবসান এবং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের

তিরোধানের পরও হিমালয়ের সানুদেশ যে চীন, তিব্বত (তুফান) ও নেপালীয় সেনাবাহিনীদের লক্ষ্যবস্তু হয় তা' ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। টাং ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় ৭০৩ সালের মধ্যে ভারত ও নেপাল তিব্বতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। এছাড়া, হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের গুরুত্বের কথা তো পূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে জনশ্রুতিতে নলরাজার নামটি স্থান পেল কেন? এই জনশ্রুতির পশ্চাতে যে কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকাই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে, নল-দময়ন্তীর কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত নিবিড় অরণ্যের কাব্যময় বর্ণনাই এই কিম্বদন্তীর ভিত্তিস্বরূপ। রাজাহারা নল ও দময়ন্তীর গভীর বন-মধ্যে উপস্থিতি ও বিচরণ এবং ভুজঙ্গের আক্রমণ ও অন্যান্য আতঙ্ককর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার কাহিনী একদা মহাকবি কালিদাসের রচনা হিসাবে গৃহীত "নলোদয়" কাব্যে (কখনও কবি বাসুদেব কর্তৃক রচিত বলে অনুমিত) বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে অবশ্য অতীতে আরও কাব্য রচিত হ'য়েছিল। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শ্রীহর্ষ রচিত "নৈষধ-চরিতম্," ত্রিবিক্রমভট্ট লিখিত "নলচম্পূ" এবং বামনভট্টবাণের "নলাভ্যুদয়"। গভীর অরণ্য-মধ্যে একাকিনী দময়ন্তীর বিলাপ, সর্পকর্তৃক আক্রান্ত হওয়া, কামাতুর ব্যাধের আগমন এবং অবশেষে একজন বণিক কর্তৃক উদ্ধারলাভ এক মর্ম-স্পর্শী কাব্যানুভূতিতে প্রকাশিত হ'য়েছে। এমনও হ'তে পারে, ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানের মত পূর্ব্ব-ভারতে হিমালয়ের এই সানুদেশেও একদা নলোপাখ্যান বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গুপ্তযুগের শিল্পে তো বিশিষ্টভাবে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী এবং তাদের তৎকালীন অভিব্যক্তি ও কাব্যরূপ। রাজাওনায় আবিষ্কৃত ও কলিকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় সংরক্ষিত দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভে রূপায়িত হ'য়েছে "কিরাতার্জুনীয়" ও "গঙ্গা-পরিণয়" এর দৃশ্যাবলী। নেপালের প্রাচীন শিল্পে যে একদা "কুমারসম্ভব" উপাখ্যান স্থান পেয়েছিল সে সম্বন্ধে

আলোকপাত ক'রেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ নীলরতন ব্যানার্জী। প্রকৃতপক্ষে, গুপ্ত যুগের রঞ্জিত চিত্র, প্রস্তর-খোদিত ভাস্কর্য্য ও পোড়ামাটির মূর্ত্তির কলা-চাতুর্য্য, ভাব-গভীরতা ও লাবণ্যে বিধৃত হ'য়েছে এক বলিষ্ঠ ও প্রীতিরসে উদ্বুদ্ধ শিল্প-বোধ ও পৌরাণিক সৌন্দর্য্যভাবনা। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, উল্লেখ করা যায় আসাম-রাজ্যে দরং জেলায় অবস্থিত দহ্ পর্বতীয়ার ভগ্ন দেউল-গাত্রে গুপ্তযুগের শৈলীতে রূপায়িত গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তিদ্বয়কে। দণ্ডায়মানা ও ঈষৎ অবনত-বদনা এক রূপবতী দেবীর হাতে রত্নমাল্য, পার্শ্বে সহচরীবৃন্দ এবং তাঁর কুণ্ডলিত কবরীর রোমাঞ্চময় সৌন্দর্য্যের আড়ালে অন্তর্ধান হ'তে চলেছে এক উড়ন্ত বলাকা। প্রায় নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এখানে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে প্রাচ্য ভারতের এক কমনীয় সৌন্দর্য্যভাবনা যা' হয়তবা উল্লেখনীয় করে তুলেছে নল-প্রণয়িনী দময়ন্তীর আত্মনিবেদিত প্রেম এবং হংসদূতের উপাখ্যানকে। দহ্ পর্বতীয়ার এই অনন্য ভাস্কর্য্যটি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতীর একটি মন্তব্য অনিবার্য্যভাবেই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর এই মতটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল :

"This emotional idiom is known to have extended further east, as is illustrated by the carvings on the door-frame from Dah Parvatiya (Darrang district, Assam) with the characteristic motifs of the river goddess, Ganga and Jamuna. The eastern version of the Gupta classical trend endows the sublimations of Sarnath with an emotional feeling and sensuous charm which are essentially human and belong to this world." (*A Survey of Indian Sculpture*, p. 143)

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে যে, হর্ষবর্দ্ধন যখন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এক বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন তাঁর নিকট প্রাগ্‌-জ্যোতিষ রাজের গোপন সংবাদ বহন ক'রে আনেন যে দূত তাঁর

নাম ছিল হংসবেগ। বিবাহের প্রাক্কালে নল-দময়ন্তীর গোপন প্রীতিই যেন এখানে উল্লিখিত হ'য়েছে রাজনৈতিক সংজ্ঞায়। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে শশাঙ্কের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে ভীত হ'য়েই প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভাস্করবর্মন এই দূত প্রেরণ করেন। (*History of Kanauj*, p. 72, fn.)।

এক কথায়, গুপ্তযুগের শিল্প, কাব্য, অলঙ্কার-শাস্ত্র, লোক-গাথা এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ সংঘাত সত্ত্বেও অটুট সামরিক তথা জাতীয় বলিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করলে স্বভাবতঃই অনুভব করা যায়, চিলাপাতার নিবিড় অরণ্যে প্রসারিত দুর্গটিকে লোকপরম্পরাগত স্থানীয় জনশ্রুতিতে কেন সংশ্লিষ্ট করা হ'য়েছে আপাত-দৃষ্টিতে নিষধাধিপতি নলের সঙ্গে ?

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজা নলের সঙ্গে বিজড়িত মধ্যভারতে প্রবাহিত কালী সিন্ধু নদীর অদূরে অবস্থিত প্রাচীন নলপুর (বর্ত্তমান নারওয়ার) নামক স্থানটি। চারণ-উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ নিজ দেশ থেকে বহির্গত হ'য়ে শোণ নদীর তীরে রোহ্‌টাস্‌গড় দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে রাজা নল এইখান থেকে পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন এবং নলপুর অথবা নারওয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। আদি-মধ্যযুগে এই নলপুর হ'য়ে ওঠে রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতের কাছাওয়াহ্‌ (কচ্ছপঘাট)-দের একটি অন্যতম রাজধানী। এই কিংবদন্তীর সত্যতা নির্ণীত না হ'লেও অনুমান করা যায়, যে, হয়ত এই কাহিনীর পশ্চাতে আছে কোন বিস্মৃত অভিযান ও রাজ্যস্থাপনের কাহিনী। তুলনীয় দৃস্টান্তস্বরূপ স্মরণ করা যায়, যে, একদা সুবিস্তৃত গুপ্তসাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পূর্ব-ভারত থেকে মধ্য-ভারতে স্থানান্তরিত হ'য়েছিল ইতিপূর্বে যেমন কতকটা এই ধরণের পরিবর্ত্তন দেখা গেছে শুঙ্গযুগের সাম্রাজ্যিক ইতিহাসে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক যখন পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁর মিত্রবর্গ মৌখরীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তখন তাঁর সুহৃদ

দেবগুপ্ত ছিলেন মালবরাজ। বাণরচিত "হর্ষচরিত" থেকে অবগত হওয়া যায়, সম্রাট শশাঙ্কের অভিযাত্রী সেনাবাহিনী একদা কান্যকুব্জ অধিকার করতে সক্ষম হয় এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে থানেশ্বর-রাজ ও শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য, হিউয়েন-সাং এর বর্ণনার উপর নির্ভর করে আলেক্সাণ্ডার ক্যানিংহাম অনুমান করেছেন, যে প্রাচীন থানেশ্বররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষিণ-পাঞ্জাব ও পূর্ব-রাজপুতানার বিভিন্ন অংশ। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ও তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নলপুর তথা নারওয়ারের ইতিহাস আরও আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। চিল্লাপাতা অরণ্যে অবস্থিত নলরাজার গড় ও মধ্য-ভারতের নলপুর যেন এক তুলনীয় জনশ্রুতির মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল। কচ্ছপঘাট (কাছওয়াহ্) বীরসিংহদেবের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ নারওয়ার অনুশাসনে (বিক্রম সম্বত ১১৭৭ তথা খৃষ্টীয় ১১২০) নলপুরকে "মহাদুর্গ" নামে বর্ণনা করা হ'য়েছে ("নলপুর মহাদুর্গ")। এই "মহাদুর্গ" কথাটি আশ্চর্য্যভাবে পশ্চিম বাঙলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নলরাজার গড় সম্বন্ধেও চিরন্তনভাবে প্রযোজ্য, যদিও স্বভাবতঃই অনুমান করা যায় যে এই বিপুল ধ্বংসাবশেষের গৌরবময় ইতিবৃত্ত আরও এক প্রাচীনতর দিগন্তের রোমাঞ্চময় রহস্যে বিলীন। অতীতের শিলালেখ, সাহিত্য ও জনশ্রুতি যেন এই রহস্যকে এমন এক সান্নিধ্যময় মহিমা ও মাধুর্য্য অর্পণ করেছে যা'র তুলনা প্রকৃতই ভারত-ইতিহাসে বিরল। নলরাজার গড়ের সুদীর্ঘ প্রাকারগুলি ও তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অরণ্যের মোহ চিরদিনই হ'য়ে থাকবে এ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার এক বিশিষ্ট প্রেরণাস্বরূপ।

পরিশিষ্ট

ক) কামতা ও কামরূপ

প্রাচীন কামতা ও কামরূপের ইতিহাস প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ও পরবর্ত্তীকালে কামরূপের অহোমগণ পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠলে কোচবিহার অঞ্চলে তথা উত্তর-বঙ্গে ও তার সন্নিহিত অংশে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলি এই রাজনৈতিক উত্থানকে ক্রমশঃ প্রতিহত করতে অগ্রসারী হয়। এইভাবে কোচবিহার তার নিজস্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত 'খেন' রাজবংশের শাসনকালে। এই সময়ে কামতা-রাজ্য ও কামতাপুর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষসমূহের অন্যতম নিদর্শন গোসানীমারি দুর্গের বিপুল আয়তন ও প্রাকার। মধ্যযুগে নির্মিত এই দুর্গটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকর্তৃক সংরক্ষিত।

'খেন' রাজবংশের তিনজন নৃপতির পরম্পরাগত অবস্থান নিম্নরূপ:

নীলধ্বজ
|
চক্রধ্বজ
|
নীলাম্বর

এই রাজাদের মধ্যে নীলাম্বর যথার্থই একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন কারণ কথিত আছে, তাঁর রাজ্যসীমা কামরূপ ও উত্তরবঙ্গের সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। পুরাতন কাহিনীসমূহ থেকে জানা যায়, যে, তাঁর এক অত্যধিক নিষ্ঠুর ব্যবহারে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা'র ফলে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্ কামতারাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত হন। রাজ-অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত ব্যভিচারের নিমিত্ত নীলাম্বর মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্রকে হত্যা করেন। এই হত্যা ও সংশ্লিষ্ট নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শচীপাত্র রাজ্যত্যাগ করেন এবং গৌড়েশ্বরকে কামতা-আক্রমণে উৎসাহিত করেন। অবশেষে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহ্ কামতার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা

করেন এবং দীর্ঘকাল অবরোধের পর কূট-কৌশলের দ্বারা দুর্ভেদ্য কামতাপুর অধিকার করেন। কথিত আছে, বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে, গৌড়ের বেগমদের ছদ্মবেশে দুর্গে প্রবেশ করতে সমর্থ হ'য়ে হুসেন শাহ্ ও তাঁর অনুগামী সেনাদল নির্ভীক ও নিপুণ যোদ্ধা নীলাম্বরকে অন্তঃপুরে নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দী করেন। পরাজিত 'খেন' রাজাকে হুসেন শাহ্ পিঞ্জরাবদ্ধ করে গৌড়ে নিয়ে যেতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু, তাঁর এই গর্বিত অভিলাষ চরিতার্থ হয়নি, কারণ পথিমধ্যেই নীলাম্বর পলায়ন করতে সক্ষম হন সম্ভবতঃ এক-অরণ্যের গভীরে এবং তারপর তাঁর পরিণতি কিম্বদন্তীর রহস্য কাননে অজ্ঞাত অথবা লোককাহিনীর প্রত্যাশায় বর্ণাঢ্য।

হুসেন শাহ্ কর্তৃক কামতা আক্রমণের প্রধান কারণ স্বভাবতঃই নীলাম্বরের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপে সাম্রাজ্য-বিস্তার। 'খেন' সম্রাটের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফলে নিশ্চিতভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্য-পথগুলি সুলতান-শাসিত গৌড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সংশয় দেখা যায়। জনশ্রুতি আছে নীলাম্বর রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলে বিভিন্ন দুর্গ ও রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। এমনও সম্ভব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি হয়ত পুরাতন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার ক'রেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যে, রাজা নীলাম্বর কামতাপুর থেকে করতোয়া-তীরে অবস্থিত ঘোড়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত এক সামরিক পথ নির্মাণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুকানন হ্যামিল্টন সিপাহী চলাচলের নিমিত্ত প্রস্তুত এই সড়কটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ, কুখ্যাত হাব্‌সী শাসনের ফলে সৃষ্ট অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশেই নীলাম্বরের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্ভব হ'য়েছিল। ডঃ হবিবুল্লার ধারণায়, "The Abyssinian anarchy must in any case have facilitated Nilambar's operations who, from all accounts, appears to have been an ambitious prince." (*History of Bengal*, Vol. II. Edited by Sir Jadunath Sarkar, Dacca 1948, p. 146)।

আমাদের বুরঞ্জী গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, যে, মধ্যযুগে অহোমগণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবল হ'য়ে ওঠে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের ধারণায়, অহোমগণ সম্ভবতঃ তিব্বতী-ব্রহ্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের মূল আগমন চিহ্নিত করে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রকাশিত একটি মূল্যবান নিবন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণিত ক'রতে সচেষ্ট হ'য়েছেন, যে, এই অহোমগণই অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন তুলনীয় নামে অভিহিত

হয় (*Journal of The Asiatic Society, Letters*, Vol. XXII, 1956, No. 2, pp. 147ff)। অহোমদের এই উত্থান দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে কামরূপ ও কামতারাজ্য তথা কোচবিহারের ইতিহাসকে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে, যে মন্তব্য করেছেন তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অহোমদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্যের ইতিবৃত্তকে তিনি অপরাপর ঐতিহাসিকদের মতই যথার্থ গুরুত্বদান ক'রেছেন, যথা,

"In Assam the Ahoms fought with the earlier Bodos, a Tibeto-Burman people who were their distant cousins, and in many places absorbed them. In addition to the Bodos, there were also the Naga and Kuki peoples who were partly absorbed by the Ahoms in the course of their expansion. The history of Assam from the early part of the thirteenth century right down to the middle of the seventeenth was primarily the history of the gradual establishment of the Ahoms as the paramount group in Assam, and they had to wage a stiff fight with the earlier Bodo peoples. This fight came to a head in the sixteenth century when some powerful rulers of Bodo origin were established in Cooch Behar in Northern Bengal and gave resistance to Ahom expansion. Finally the Ahoms became supreme by about A. D. 700, near about which date was the greatest advancement of their political power." (*Ibid*, p. 150)। এখানে উল্লেখযোগ্য, যে, আসামের পুরাতন বুরঞ্জীসমূহে অহোমগণ কর্তৃক দুর্গ-নির্মান, নৌবহর সৃষ্টি এবং সামরিক অভিযান-সমূহের উল্লেখ আছে। অহোমদের এই উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়শঃই বিশেষভাবে বিবেচিত হবে কোচবিহার তথা প্রাচীন কামতাভূখণ্ডের ইতিহাস। এখানে অবশ্যই উল্লেখনীয় অতীত উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপের ঘনিষ্ঠতা। প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বিবরণীসমূহে বিশেষতঃ কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের যে তাৎপর্য্যময় জ্যামিতিক পরিমণ্ডল বর্ণিত হ'য়েছে তার পশ্চিম অংশই সৌমার পীঠ অথবা ঐতিহাসিক কামতার মূল ভূখণ্ড বলে বিবেচিত হয়। 'খেন' রাজবংশের পতনের পর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'কামতেশ্বর' বিশ্বসিংহ বহুলাংশে উদ্ধার করেন এই দেশের হৃত-গৌরব এবং তাঁর সঙ্গে সংঘাত অব্যাহত থাকে গৌড়ের

সাম্রাজ্য অভিলাষী প্রশাসন এবং স্থানীয় ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে। তাঁর রাজ্য মূলতঃ বিস্তৃত ছিল পূর্বে বড় নদী থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজভ্রাতা চিলারায় (শুক্লধ্বজ) বিশেষভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেন পাঠান সুলতান শাসিত গৌড় এবং অহোম-অধ্যুষিত আসামের বিরুদ্ধে। প্রথমে বিজয়ী হ'লেও তিনি সাময়িকভাবে পরাজিত হন গৌড়েশ্বরের নিকট। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চিলারায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণের জীবনাবসানের পর কোচরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। সঙ্কোশ নদীর পূর্বাংশের নাম হয় 'কোচ হাজো' এবং পশ্চিমাংশের নাম হয় 'কোচবিহার'।

কামতা তথা কোচবিহার ও উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন পথগুলিই যেন একদা অনুসৃত হ'য়েছিল কালাপাহাড় ও মীরজুমলা কর্তৃক পরিচালিত আসাম অভিযানের কালে। এখানে উল্লেখনীয়, যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মীরজুমলা কর্তৃক পরিচালিত আসাম আক্রমণের ফলে সেখানকার নৃপতি জয়ধ্বজ পরাজিত হ'লেও অবশেষে কোচবিহার চিরতরে মুঘলের হস্তচ্যুত হয়। এইভাবেই অম্লান থাকে কামতার অতীত গৌরব উত্তরের নিবিড় বনানী ও পার্বত্য-ভূমির প্রত্যন্তসীমায়।

পরিশিষ্ট (খ)

উত্তরবঙ্গে চিলাপাতা অরণ্যে 'ধানিয়া ধ্বংসাবশেষ' (নলরাজার গড়) ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের তরুলতা ও বিচরণশীল পশু ও প্রাণীকুল সম্বন্ধে রাজ্যের বন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিবরণ সম্বলিত পত্রের সারাংশ :

Shri S. S. Mandal, I.F.S.,
Conservator of Forests,
Soil Conservation Circle,
West Bengal.
33, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-12.

D.O. No. 2213/2E-1(1) dated Calcutta, the 23rd August, 1968.

Dear Shri Das Gupta,

Sub : *Information regarding Bania Ruins*

I furnish below the list of the flora and fauna which are available around the area known as Bania Ruins in the Chilapata Reserved Forests of Cooch Behar Forest Division with their local and common names :—

1. Trees

Common name	*Botanical name*
Sal	Shorea robusta
Champ	Michelia champaca
Lasuni	Amoora rohituka
Chilauni	Schima wallichii
Latore	Artocarpus chaplasa
Katus	Castanopsis indica
Kalikath	Cephalanthus occidentalis
Lali	Amoora wallichii
Gobre	Echinocarpus spp.
Odal	Sterculia villosa
Jam	Syzygium cumini
Dabdabe	Garuga pinnata
Rasune	Dysoxylon malabaricum
Parari	Stereospermum tetragonum
Moina	Tetrameles nudiflora
Kadam	Anthocephalus cadamba
Banian (Bat)	Ficus bengalensis
Ramgua	Myristica longifolia
Chikrasi	Chukrasia tabularis
Toon	Cedrela toona
Sirish	Albizzia procera
Panchpate	Vitex quinata
Patpate	Miliosma simplicifolia
Dhouli	Premna mucronata
Kanchan	Bauhinia malabarica
Nageswar	Mesua ferrea
Hatipaila	Pterospermum acerifolium
Dumur	Ficus glomerata
Chalta	Dillenia indica
Tantri	Dillenia pentagyna

2. *Shrubs and under-growth*

Cane
Laportea spp.
Fern
Pipul
Bhant
Golcha leaf
Patibet

3. *Fauna*

Deer
Wild fowl
Lizard
Monkey
Wild squirrel
Python

Apart from the above such big games as the elephant, the rhinoceros, the tiger and the tusked boar may also be seen to roam in the jungles often impenetrable in the interior.

Special feature

The area is a bit moist with lot of ferns and mosses as ground cover. There is indication of old ponds and water channels in the area. There are also very big sized and superior quality Champ trees in the area some of which are even upto girth of 17 ft. Champ and Banyan trees are also seen over old walls of the Bania Ruins.

Shri P. C. Das Gupta,
Director of Archaeology.

Yours sincerely,
Sd/ S. S. Mandal.

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ-সূচী

Arthasastra of Kautilya — Edited by Shamasbastri

আমানতুল্লা আহমদ খান চৌধুরী — "কোচবিহারের ইতিহাস", প্রথম খণ্ড। *(History of Cooch Behar Vol, I.)*

"বাংলার ভ্রমণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড — পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। ১৯৪০।

Brown, Percy : *Indian Architecture* (Buddhist and Hindu Period), Fourth Edition, 1959, *Indian Architecture* (Islamic Period), Third Edition, Bombay.

Buddhaprakash : *The Geographical And Cultural Aspects of The Northern Itinerary, of Raghu As Described By Kalidasa*, Journal of the Royal Asiatic Society, Letters, Vol. XXII, No. 2, 1956.

Chatterji, Suniti Kumar : *Kirata-Janakriti*, Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal (JRAS), 1950.

The Name 'Assam-Ahom', Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XXII, 1956, No. 2

Chattopadhyay, Aparna : *Some References To Animal Hunting In Ancient Sanskrit Literature*, Journal of the Asiatic Society (JAS), Vol. VIII, No, 2, 1966.

Das Gupta, T. C. : *Aspects of Bengali Society*.

"প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"।

Das Gupta, P. C. : *Archaeological Discovery In West Bengal*, A Bulletin of the Directorate of Archaeology, West Bengal, No. 1, 1962.

Nalrajar Garh—A Fortification Lost In Jungle, Calcutta 1968.

An Ancient Defence of the North-East, Amrita Bazar Patrika, 12th Jan, 1969

District Gazetteers : প্রকাশিত বিবরণী সমূহ।

Dutta, B. B. : *Town Planning In Ancient India*, Calcutta 1925.

Frazer : *Tour In Himala Mountains*.

Galt, Sir Edward : *History of Assam*, 2nd Edition, Calcutta 1926.

Ghosh, D. P. : *The Chaitya Window Motif*, J. N. Banerjea Volume.

History of Bengal : Vol. I, Dacca. 1943. Edited by R. C. Mazumder ; Vol. II, Dacca. 1948, Muslim Period (1200-1757) Edited by Jadunath Sarkar.

Hakluyt's Voyages, Vol. II, p. 257.

Journal of the Numismatic Society Of India (JNSI): Vols. XI & XVII.

মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলা দেশের ইতিহাস-মধ্যযুগ। কলিকাতা ১৩৭৩

Marco Polo Travels : Translated In English by L. F. Benedetto & Prof. Aldo Ricci.

Pemberton, Capt. R. Boileau : *Report on Bootan*, Calcutta. 1839.

Ray, Amita : *Villages, Towns and Secular Buildings in Ancient India*, Calcutta 1964.

Ray Choudhuri, H. C. : *Political History of Ancient India* 4th Edition. Calcutta.

Ray, H. C. : *Dynastic History of Northern India*, Vols. I & II Calcutta 1931.

Roy, S. C. : *Early History & Culture of Kashmir*, Calcutta 1957

Roy, Udai Narain : *Fortifications of Cities In Ancient India*. Indian Historical Quarterly, March 1954, No. 1, Vol. XXX.

Sen, B. C. : *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, Calcutta 1941.

সেন, দীনেশচন্দ্র : বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২য় খণ্ড।

Sircar, D. C. : *Select Inscriptions*.

Sivaramamurti, C. : *A Guide To The Archaeological Galleries Of The Indian Museum*, Calcutta. 1954.

Tripathi, Ram Shankar : *History of Kanauj*, Benares. 1937.

Tyrwhitt, Jaqueline : *The City of Ch'ang-An Capital of the T'ang Dynasty of China*, The Town Planning Review, Liverpool, Vol. 39, No. 1, April 1968.

Yule, H. & Cordier H : *Travels of Marco Polo*, London 1931, Translated by Ricci.

বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীজে, সি, সেনগুপ্ত ও শ্রীঅশীন ব্যানার্জী কর্তৃক প্রদত্ত অপ্রকাশিত বিবরণীগুলি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

চিত্রসূচী

১৪। খিলান-তলে প্রসারিত দক্ষিণ-প্রাকার। নলরাজার গড়। উদ্ভিদাদি, বালুকাস্তর ও ইষ্টকখণ্ড অপসারণের পর গৃহীত চিত্র।

১৫। সনল কুলুঙ্গির সারি। পশ্চিম প্রাকার। নলরাজার গড়।

১৬। দুর্গাভ্যন্তরে প্রসারিত পরিখা তথা বাঁধানো খালের ধারে ইট নির্মিত সোপানশ্রেণী। নলরাজার গড়।

১৭। দেব দেউলের ধ্বংসাবশেষ সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রস্তর-খোদিত দ্বার-শীর্ষ (lintel)। নলরাজার গড়। চিলাপাতা অরণ্য। জলপাইগুড়ি জেলা।

১৮। বটেশ্বর দেউলের ধ্বংসাবশেষে 'কীর্তিমুখ' খোদিত বিপুলায়তন দ্বারশীর্ষ (lintel)। প্রস্তর. জলপাইগুড়ি জেলা।

১৯। অরণ্যাবৃত ধ্বংসাবশেষ। নলরাজার গড়।

২০। অরণ্য-ছায়ায় প্রসারিত মন্দির স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ।
নলরাজার গড়।

২১। নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের পার্শ্বে প্রসারিত মন্দির স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত একটি পাষাণ-খণ্ডে খোদিত 'ভূমি-আমলক' ও কলস। আদি-মধ্যযুগ।

২২। দেউল স্থাপত্যের অবয়ব। খোদিত প্রস্তর খণ্ড। নলরাজার গড়। (ইঙ্গিতজ্ঞাপক পরিমাপক)

২৩। মন্দির-স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যে আবিষ্কৃত একটি প্রস্তর খণ্ডে রূপায়িত মোড়ানো লতা। নলরাজার গড়। মণ্ডন-শিল্পে গুপ্তযুগের রীতি লক্ষণীয়।

২৪। নলরাজার গড়ের পশ্চিম-প্রাকারে অবস্থিত একটি সনল কুলুঙ্গির প্রস্থচ্ছেদ।

২৫। নলরাজার গড়ের সমীপে প্রবাহিত ছায়াচ্ছন্ন বানিয়া নদী।

২৬। নলরাজার গড়ের পশ্চিম প্রাকারে অবস্থিত সনল কুলুঙ্গি (chimneyed niche) সমূহের আংশিক চিত্রণ।

২৭। পাষাণ-খণ্ডে রূপায়িত 'গবাক্ষ' চিত্র। সম্ভবতঃ গুপ্তরীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ। নলরাজার গড়।

২৮। নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের পার্শ্বে প্রসারিত মন্দির-স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষে অবস্থিত একটি কারুমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড। কুণ্ডলিত রেখা অথবা বল্লরীর মধ্যে রূপায়িত বিহঙ্গ গুপ্ত-রীতির এক পরিচিত নিদর্শন। পরবর্তী যুগেও অবশ্য এই রীতি অনুসৃত হ'য়েছে।

২৯। নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের পার্শ্বে প্রসারিত মন্দির স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষে অবস্থিত একটি পাষাণ-খণ্ডে খোদিত 'ভূমি-আমলক' ও কলস। আদি-মধ্যযুগ।

৩০। তিস্তার পূর্বতীরে ময়নাগুড়ির অদূরে অবস্থিত বটেশ্বর দেউলের প্রাঙ্গণে ভূপ্রোথিত দুইটি কারুকার্যময় প্রস্তর স্তম্ভ।

৩১। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবাহিত তিস্তার বিস্তীর্ণ স্রোতধারা ও বনজ-সৌন্দর্য্য।

৩২। প্রাচীন বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বটেশ্বর দেউলের ধ্বংসাবশেষ। জলপাইগুড়ি জেলা।

৩৩। কিংবদন্তী-বিজড়িত ভীমপাহাড়। অরণ্যাবৃত এই টিলার চূড়ায় মধ্যযুগের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দার্জিলিং জেলা।

৩৪। হিমালয়ের প্রান্তস্থিত বনাঞ্চলের দৃশ্য। দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত ভীমপাহাড়ের চূড়া থেকে গৃহীত চিত্র।

৩৫। ডালিমকোটের পার্শ্বে প্রবাহিত চেলনদীর গিরিখাত। নিম্ন হিমালয়। দার্জিলিং জেলা।

৩৬। পুরাতন দেউলের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান দ্বারপাল। মধ্যযুগ। পূর্বদহ। জলপাইগুড়ি জেলা।

৩৭। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সুবিখ্যাত জল্পেশ্বর মন্দিরে একদা সংরক্ষিত পুরাতন ঘণ্টা। ঘণ্টার গায়ে তিব্বতী অক্ষরে লেখা আছে "ওঁ বজ্রগুরু পদ্মসিদ্ধি"। একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী অতীতে ভুটানের কোন এক আক্রমণকারী নরপতি ভক্তিবশতঃ জল্পেশ্বর মন্দিরে এই ধাতুনির্মিত ঘণ্টাটি উৎসর্গ ক'রে যান।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারিতে সংরক্ষিত।

৩৮। কিংবদন্তী-বিজড়িত পুরাতন ঢিবি। জোড়াদীঘি। জলপাইগুড়ি জেলা।

৩৯। অধুনা-সংস্কৃত পুরাতন দেউল। পূর্বদহ। জলপাইগুড়ি জেলা।

৪০। প্রস্তরনির্মিত পুরাতন দেউলের খাঁজকাটা প্রাচীর। পূর্বদহ। জলপাইগুড়ি জেলা।

৪১। বিষ্ণু। কৃষ্ণ প্রস্তর। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী। দেওয়ানি কৃষ্ণপুর। দার্জিলিং জেলা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত

৪২। রাজস্থানের অন্তর্গত বায়ানায় আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রায় সম্রাট কুমারগুপ্ত কর্তৃক সখড়্গ গণ্ডার নিধনের চিত্র। কোন কোন মুদ্রাতত্ত্ববিদের ধারণায় এই চিত্রটি আসাম কিংবা হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয়জ্ঞাপক।

৪৩। নিম্ন-হিমালয়ের গভীরে প্রবাহিত তিস্তা। কালিম্পং মহকুমা। দার্জিলিং জেলা।

৪৪। ইঁটে বাঁধানো প্রবাহ-পথ। দক্ষিণ-প্রকার। নলরাজার গড়। ৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

৪৫। সংকীর্ণ ধাপযুক্ত প্রাচীর। অন্তঃপ্রাকারের সীমিত দৃশ্য। নলরাজার গড়।

৪৬। আংশিক উদীচ্য-বেশ পরিহিত সূর্যমূর্তি। কৃষ্ণপ্রস্তর। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। শীতলকুচি। কোচবিহার।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত।

নির্ঘণ্ট

পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব অধিকারের অধীক্ষক ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জী এই বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টটি প্রস্তুত করে লেখকের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৭	৭	আদুর	আমুর
১৯	১৪	বিংবা	কিংবা
	১৭	বগুরা	বগুড়া
	২১	উংলেখোগ্যায়	উল্লেখযোগ্য
২৩	১৯	উল্লেখ্নীয়	উল্লেখনীয়
২৬,	২৮-২৯	কুমারগুপ্ত	প্রথম কুমারগুপ্ত
২৮,	৩০	পুণ্ড্রবর্দ্ধনভূক্তি	পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি
৩০ ;	৫	জান	জানা
৩৪	৯	ভুটাংনের	ভুটানের
৩৬	২৩	ইংন্দো-মোঙ্গেলীয়	ইন্দো-মোঙ্গলীয়
৩৮,	১৬-১৭	নির্মান	নির্মাণ
৫৪	শেষ লাইন	*Geograhic*	*Geographic*
৫৫	৮	প্রায়ক্ষকার	প্রায়াক্ষকার
৬৬	১৭	ডুমিকম্প	ভূমিকম্প
৬৭	২,৩	কাকেও	কিয়োকু
৭৮	১২	আক্রেমণ	আক্রমণ
	১৬	ধ'নিয়া	বানিয়া

চিত্রাবলী